লক্ষ্মী মা।

শ্রীবিধুভুষণ বসু কর্ত্তৃক

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

শ্রীরেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১২

উৎসর্গ পত্র।

বঙ্গীয় মাতৃগণ!

হতভাগা লেখক যখন স্নেহময় মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তখন মধুময় 'মা' কথা উচ্চারণ করিবারও তাহার শক্তি ছিল না। কিন্তু যে স্নেহের রাজ্যে জন্মিয়াছি, সে স্থানে মাতৃহারা হইয়াও মাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত হইলাম না। বঙ্গের রমণী-হৃদয় বাৎসল্যের মহাসিন্ধু! শত শত জননী মাতৃহীন শিশুকে ক্রোড়ে লইতে বাহু প্রসারিত করিলেন; শত শত জননীর স্তন্যামৃতে এ দেহ পুষ্ট হইল। এখন মা বলিতে শিখিয়াছি; কোনও দিন প্রাণ ভরিয়া মা বলিতে পাই নাই, মা বলিতে বড় সাধ। তাই সহস্র-মাতৃপালিত সন্তান সহস্র জননীকে আনন্দে "মা মা" বলিয়া, এই অতি তুচ্ছ ধূলী-উপকরণে তাঁহাদের পদ পূজা করিয়া ধন্য হইল।

১৫ই মাঘ, ১৩০৫।
বিষ্ণুপুর।

চিরকরুণাঋণী,
গ্রন্থকার।

লক্ষ্মী মা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অন্নদানে জীবনদান।

ক্ষীর-প্রবাহিনী ধলেশ্বরী নদী-তীরে বহুদূর-ব্যাপী সুদৃশ্য প্রান্তর;—প্রান্তরের নাম রাজাপুরের মাঠ। তাহার উপরে রাজাপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের অধিবাসিবৃন্দের অধিকাংশই কৃষিজীবী, ইতর জাতীয়; কেবলমাত্র এক-পার্শ্বে পাঁচ ঘর ব্রাহ্মণের বসতি আছে। এই অংশকে গ্রামবাসীরা "বামণপাড়া" বলিত। গ্রামের অবস্থা তত উন্নত না হউক, কিন্তু বড় শান্তিময় ছিল। মাঠে প্রচুর শস্য জন্মিত। প্রতি গৃহস্থের ছোট হউক, বড় হউক, এক একটী নারিকেল, কদলী, আম্র, কাঁঠাল প্রভৃতির বাগান, ও একখানি করিয়া আলু বেগুণ প্রভৃতি তরকারীর ক্ষেত ছিল; নদীতে সুস্বাদু জল; সুতরাং সহজ জীবিকার্জ্জনে কাহারও বড় কষ্ট হইত না। সকলেরই কর্ম্মকুশল নীরোগ শরীর। সকলেই ক্ষেতের শস্য,

কিন্তু কি পাপে জানি না, বিধাতা রাজাপুরের প্রতি বি
হইলেন। এক বৎসর প্রবল বন্যা আসিয়া মাঠের অধিক
শস্য নষ্ট করিয়া ফেলিল। কৃষকেরা দুই আনা রকম
পাইল। সকলেরই বিশেষ কষ্ট হইল। থালা, বাটী ইত্য
তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া কোনও রূপে প্রাণ বাঁচাইয়া আগ
বৎসরের আশায় রহিল। কিন্তু ভূমিদেবী অনুকূল হইলেন ন
পরবৎসর দেশময় দারুণ অনাবৃষ্টি হইল। জলের অভ
কৃষকগণ জমীর পত্তন করিতে পারিল না। নদী বা খাদে
জল সেঁচিয়া যাহা কিছু রোপণ করিল, তাহাও জলের অভা
শুকাইয়া গেল। রাজাপুরের চিরপ্রসিদ্ধ উর্ব্বর-শস্য-শ্যামল ক্ষে
ভীষণ মরুভূমিবৎ ধূ ধূ করিতে লাগিল! দারুণ অন্নক
গ্রামময় হাহাকার পরিব্যাপ্ত হইল!

বিধাতার লীলা বুঝা ভার! যে রাজাপুর অন্নের জন্মস্থ
ছিল,—যে স্থানে মা লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী বিরাজমানা ছিলেন,
যাহার অন্নে পঞ্চসহস্র জীবের জীবনরক্ষা হইত, আজ সে
রাজাপুরবাসিগণ অনাহারে হাহাকার করিতেছে! আবা
বৃদ্ধ-বনিতার রোদন-ধ্বনিতে শ্রবণ বধির হইয়া যাইতেছে
শান্তির চিরবাসস্থান রাজাপুর আজ অশান্তির ক্রীড়াভূমি
প্রতি গৃহই শ্রীহীন; বড় বড় মড়াই রহিয়াছে, তাহাতে
তুষটীও নাই; বড় বড় গোয়াল,—তাহাতে গো মহিষাদি
কিছুই নাই, অন্নের জ্বালায় সকলই অর্দ্ধমূল্যে সিকিমূল্যে বা
বিনামূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। গৃহে জলপাত্রটী

সিদ্ধ করিয়া বা কাঁচা খাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে। দেশে ভিক্ষা মিলে না, ভিক্ষা কে দিবে? দেশময় অনাবৃষ্টি, দেশময় দুর্ভিক্ষ, সকলেই অন্নের কাঙ্গাল। যাহাদের অর্থের সঙ্গতি আছে, তাহারা ভিন্ন-দেশ হইতে ধান চা'ল আনিয়া কথঞ্চিৎ প্রাণ রক্ষা করিতেছে; কিন্তু পরকে দিতে পারিতেছে না।

প্রত্যহ কত লোক অনাহারে মরিতেছে! অন্য স্থান অপেক্ষা রাজাপুরের অবস্থাই অধিকতর শোচনীয়! কারণ সে স্থানের প্রায় সকলেই কৃষিজীবী, ধনহীন। যে রাজাপুরের অধিবাসিবৃন্দ স্বাস্থ্যের বিমল আনন্দে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ছিল, আজ তাহাদের দিকে তাকাইলে ভয় হয়! চক্ষু কোটর-গত, মুখমণ্ডল শুষ্ক, ললাটে শিরা সকল ভাসিয়া উঠিয়াছে, শরীরে অস্থিচর্ম্ম মাত্র অবশিষ্ট আছে, অবিরাম দীর্ঘনিশ্বাস বহিতেছে, পলে পলে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছে!

অহো! স্নেহময় পিতামাতার সম্মুখে শিশুসন্তান "খেতে দাও, খেতে দাও" বলিয়া দেহ ত্যাগ করিতেছে! পতির সম্মুখে পত্নী অনাহারে কাল-কবলে পতিত হইতেছে! ভ্রাতার ক্রোড়ে ভগিনী ক্ষুধার জ্বালায় মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছে!

ঐ দেখ, গ্রামের মধ্যস্থলে একটী বড় বাড়ীতে কি ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে। কৃষকগণের মধ্যে এই বাড়ীর গৃহস্থেরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান্ ছিল। এই বাড়ীর কর্ত্তা কৃষকদিগের মাতব্বর। পূর্ব্বের সৌভাগ্যের চিহ্ন এখনও অনেক বর্ত্তমান আছে। বড় বড় ঘর, বড় বড় মরাই,

দশায় শয্যাগত; পার্শ্বে বৃদ্ধা পত্নী ক্ষুধার জ্বালায় মূর্চ্ছিতা! একটী পৌত্র ও একটী দৌহিত্র অনাহারে মারা গিয়াছে! চতুর্দ্দিকে বালক, বালিকা, কন্যা ও বধূগণ হাহাকারে রোদন করিতেছে! বৃদ্ধের দুইটী পুত্র জীর্ণ-শীর্ণ-দেহে মুমূর্ষু পিতামাতার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে! অহো! কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য! যোগ্য-পুত্রের সম্মুখে বৃদ্ধ পিতামাতা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছেন! আজ এই পুত্রদ্বয়ের হৃদয়ের শোণিত লইয়া কেহ যদি তাহাদিগের পিতামাতাকে মুষ্টি অন্নদান করে, তাহাতেও তাহারা পরমানন্দে কৃতজ্ঞচিত্তে সম্মত!—অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা! সর্ব্বসম্পদ-দায়িনী মা লক্ষ্মী! ভাগ্য-হীন রাজাপুরবাসিগণের প্রতি কি তোমরা কৃপা-কটাক্ষ-পাত করিবে না?

কতক্ষণ পরে একজন শীর্ণকায় যুবক একখানি ছেঁড়া গামছায় কতকগুলি ভাত লইয়া উপস্থিত হইল। দেখিবামাত্র বালকবালিকাগণ দৌড়িয়া ছুটিল। সকলে দুই হাত দিয়া খাইতে লাগিল, একে অপরের হাত চাপিয়া ধরিতে লাগিল। যে ভাত আনিয়াছিল, সে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধের জ্যেষ্ঠপুত্র, পুত্রগণ অনেক চেষ্টা করিয়া বালকবালিকার মুখ হইতে কাড়িয়া বৃদ্ধ পিতামাতাকে কিছু খাওয়াইয়াছিল। কাহারও ক্ষুধার চতুর্থাংশও নিবৃত্ত হইল না। কিন্তু ভাতের বল বড় বল, কিছুক্ষণ পরে সকলেই একটু সুস্থ হইল। তখন বৃদ্ধ পুত্রকে বলিল, "বাবা! ভাত পাইলি কোথায়?"

পুত্র বলিল, "বাবা! জগদীশ্বর আমাদের প্রতি আবার মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন আমরা বুঝি আরও কিছুদিন

বাঁচিব। আমাদের সেই অন্নপূর্ণা মাতা আমাদের জীবন রক্ষার বিলক্ষণ সুযোগ পাইয়াছেন। তাঁহার স্বামী মগের দেশ হইতে চা'ল আনাইয়া দেশে পাঠাইয়াছেন। এবার বিষয় বিক্রয় করিয়া টাকা দিয়াছেন। আহা! আমাদের জন্ম দয়াময়ী কি না করিতেছেন।"

শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "আহা! মায়ের নামটী হৈমবতী;—যথার্থই মা হৈমবতী, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। আমাদের জন্ম মা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। মায়ের গায় একখানিও গয়না নাই; পরণে ছেঁড়া ন্যাকড়া! নিজে দু'বেলা পেট পূরিয়া আহার করেন না! শরীর ক্রমে যেন শুকাইয়া যাইতেছে! নিজহস্তে পাক করিয়া প্রত্যহ শত শত লোককে অন্নদান করেন।"

পুত্র বলিল, "তবু পরিশ্রম হইয়াছে, এমন কোনও চিহ্ন তাঁহাতে দেখিতে পাই না। আমাদের কষ্ট দেখিয়া সর্ব্বদাই জননীর চক্ষে জল ঝরিতেছে। আমাদের পেটপুরে আহার দিতে পারিলে তিনি কত আনন্দিত হন।—বাবা! উনি মানুষ নন্, নিশ্চয়ই দেবতা।"

পিতা। উনি যদি দেবতা না হইবেন, তবে দেবতা আর কে? যিনি শত শত লোকের জীবন রক্ষা করিতেছেন, তিনি যথার্থই দেবতা। নিশ্চয়ই মা অন্নপূর্ণা আমাদের দুঃখ দেখিয়া ছদ্মবেশে পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম লইয়াছেন। মায়ের কৃপায় রাজাপুর রক্ষা হইল। এতদিন হেথায় একটী প্রাণীও বাঁচিত না। আর পনরটা দিন কোনও রূপে চলিলে,—এই আষাঢ় মাসটা কাটিয়া গেলে, আউস

জন্মিবে, বাঁচিবার আশা হইবে। কিন্তু আমি আর বাঁচিতে চাহি না। এ সময়ে আমার মরণই মঙ্গল। আমার বাছারা আমারই সাম্‌নে অনাহারে মারা গেল! আমি কোন্ সাধে বাঁচিব? আমি মরিব; মরিবার পূর্ব্বে একবার আমাদের অন্নপূর্ণা মায়ের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া যাইব। আমি এজন্মের তরে মাকে একবার দেখিয়া আসি।"

যষ্টিভর করিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলে নিষেধ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ কাহারও কথা গ্রাহ্য করিল না। অন্নের রস পাইয়া বৃদ্ধ কথঞ্চিৎ সবল হইয়াছে; ধীরে ধীরে বামনপাড়ার দিকে চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

করুণাময়ী লক্ষ্মী মা।

বামণপাড়ায় যে কয় ঘর ব্রাহ্মণের বসতি আছে, তন্মধ্যে ছোট একটী ইষ্টকালয়ের দ্বারদেশে কয়েকজন ভিখারী দাঁড়াইয়া আছে। বেলা অপরাহ্ন; ভিখারীরা "মা! লক্ষ্মী মা! কিছু দাও মা!" বলিয়া ঘন ঘন ডাকিতেছে। ভৃত্য তাহাদিগকে কিছু চাউল দিয়া বলিতেছে, "আজ এখন যাও; এখন খাবার কিছুই নাই। মা ঠাকুরাণী স্নান করিতে গিয়াছেন। এই বেলাটা বয়ে যায়, এখনও তিনি জলটুকু মুখে দেন নাই।"

ভিখারীরা ভৃত্যের কথা শুনিয়া হতাশ হইয়া প্রস্থান করিল। তাহারা জানিত, মা ঠাকুরাণী স্নান করিতে গেলে পর আর কিছুই থাকে না। সমস্ত ভিখারীরা প্রস্থান করিল বটে, কিন্তু একজন কঙ্কাল-সার বৃদ্ধ কিছুতেই দ্বার পরিত্যাগ করিল না। ভৃত্য পুনঃপুনঃ তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিল, সে তাহা মানিল না; কেবল অতি কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, "মা! লক্ষ্মী মা! অন্নপূর্ণা মা! একটু পায়ের ধূলি দে মা! একবার দেখা দে মা!"

ভৃত্য বিরক্ত হইয়া গালি দিল। বৃদ্ধ অতি দীনভাবে

বলিল, "ভাই, কেন বাধা দিচ্ছ? আমি অন্য কিছু চাই না, কেবলমাত্র করুণাময়ী মায়ের বিন্দুমাত্র পদধূলি চাই। আমার জীবনের আশা শেষ হইয়াছে; জন্মের শোধ একবার মা অন্নপূর্ণার চরণ দর্শন করিতে দাও।"

চক্ষের ধারায় বৃদ্ধের বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এই সেই অনশন-ক্লিষ্ট শোক-কাতর মুমূর্ষু বৃদ্ধ; অনাহারে মরণাপন্ন অবস্থায় সহসা অন্নভিক্ষা পাইয়া, তাহার হৃদয় অনিবার্য্য ভক্তি-কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাহার একান্ত ইচ্ছা, সে তাহার জীবনদায়িনীকে একবার দেখিবে, তাঁহার চরণের রেণু মাথায় লইয়া সে একবার তাহার আন্তরিক ভক্তি প্রকাশ করিবে। ক্ষুধার জ্বালা যে ভুগিয়াছে, সেই জানে অন্নের কি মূল্য!—ক্ষুধায় যে অন্নদান পাইয়াছে, সেই জানে অন্নদাতার কি মহিমা! ভৃত্য তাড়না করিতে লাগিল; বৃদ্ধ কিছুতেই ফিরিল না, কেবল বলিতে লাগিল "আমি একবার মাকে দেখিব।—মা! দেখা দে মা!"

অল্পক্ষণ পরে আর্দ্রবসন-পরিহিতা চম্পক-বর্ণা একটী সুন্দরী রমণী দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমণীর বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসরের অধিক হইবে না; কিন্তু সেরূপ করুণাময়ী দৃষ্টি, সেরূপ স্নেহ-গম্ভীর স্থিরভাব, অশীতি বর্ষীয়া বৃদ্ধারও সম্ভবে না। করুণার প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপিণী রমণী মধুরকণ্ঠে বলিলেন, "স্থির হও বাছা! তুমি কি কিছু খে'তে পাও নাই?"

রমণী সম্মুখীন হইবামাত্র বৃদ্ধ তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল, কোনও কথা বলিতে পারিল না; শোক, দুঃখ, অনশন-ক্লেশ ও মনের আবেগ প্রভৃতিতে বৃদ্ধ অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে

গড়াইয়া পড়িল। স্নেহময়ী-জননীর ন্যায় রমণী তাহাকে ধরিলেন দেখিয়া ভৃত্য বলিল, "মা, আপনি কেন ধরিলেন? আমি ধরিতেছি। এই সন্ধ্যাবেলা স্নান করে এলেন্, আবার এখন ওকে ছুঁইলেন!"

রমণী বলিলেন, "রামধন! মানুষ কি কথনও মানুষের অস্পৃশ্য! এমন অবস্থায় যদি ছোট বড় জ্ঞান করিবে, তবে মানুষের মনুষ্যত্ব কি? তুমি শীঘ্র একটু জল নিয়া আইস, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বৃদ্ধের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে।—রামধন! এ বড় মানী লোক ছিল; আজ দুঃসময়ে পড়িয়া এর এমন দুরবস্থা হইয়াছে।"

ভৃত্য জল আনিল; রমণী বৃদ্ধের মুখে অল্প অল্প জল দিতে লাগিলেন। পাঠক-পাঠিকাগণ! আমরা এই অনাথ-জননী মহাদেবীকে তোমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া ধন্য হইলাম। একবার দেখিয়া লও,—মায়ের মোহন মূর্ত্তিটী একবার ভাল করিয়া অবলোকন কর। ঐ যে ছিন্নবাস-পরিহিতা নিরাভরণা কিঞ্চিৎ শীর্ণকলেবরা স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিতেছ;—দেখিয়াছ, উহা হইতে কেমন মনোহর সুকোমল স্নেহের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে? দেখিয়াছ, মায়ের নয়নযুগল হইতে পবিত্র জাহ্নবী-ধারাবৎ কেমন স্নেহের ধারা সংজ্ঞাহীন ভূপতিত বৃদ্ধের অঙ্গে বর্ষিত হইতেছে?—কেমন বাৎসল্য সহকারে দেবী অঞ্চল-সঞ্চালনে মুমূর্ষু বৃদ্ধের দেহে ব্যজন করিতেছেন? রত্নালঙ্কার-বিভূষিতা রাজ-গৃহিণী সুকুমারাঙ্গী রূপসী অপেক্ষা এই দীন-জননী দীনা রমণীর কত মহিমা! তাহা বুঝিলে কি? ইহার নাম হৈমবতী; অন্য পরিচয় ক্রমশঃ পাইবে।

কতক্ষণ পরে বৃদ্ধের চেতনা সঞ্চার হইল, হৈমবতীর মুখের দিকে চাহিয়া ভক্তি-বিগলিত কণ্ঠে বলিল, "মা! পদধূলি দাও মা। আমার স্বর্গলাভ হ'ক্।"

হৈমবতী কোনও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধকে ধরিয়া তুলিলেন, এবং রামধনকে, বৃদ্ধকে ধরিতে বলিয়া বাড়ীর মধ্যে গেলেন। অল্পক্ষণ পরে একখানি থালায় অন্নব্যঞ্জন আনিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে রাখিলেন। তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ কাঁদিয়া বলিলেন, "মা! আমি আজ অন্নের জন্য আসি নাই। আমি মরিতে-ছিলাম, তোমার প্রসাদ খাইয়া বাঁচিয়াছি। কিন্তু আর আমি বাঁচিতে চাই না। আমি মরিতে আসিয়াছি। তোমার চরণ দেখিয়া,—তোমার পদধূলি মাথায় লইয়া মরিলে আমি স্বর্গ পাইব, তাই তোমার সম্মুখে মরিতে আসিয়াছি। বড় আশা ছিল, মরণকালে কাশীতে গিয়া মরিব। মা! তুমি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ;—তোমার পদতল কাশী অপেক্ষাও পবিত্র তীর্থ।"

বৃদ্ধের কাতরোক্তিতে হৈমবতী ঘন ঘন চক্ষু মুছিতে লাগিলেন, এবং মায়ের ন্যায় স্নেহ-পূর্ণ কথায় বলিলেন "বাছা! আর কাঁদিও না, ঈশ্বরকৃপায় তোমরা বাঁচিবে; মা ভবানী তোমাদের দুঃখ দুর করিবেন। আমার এক শত মণ চাউল আসিতেছে। শুনিলাম গবর্ণমেণ্ট হইতেও চাউল দান করা হইতেছে। চিন্তা কি? এখন কিছু আহার করিয়া শান্ত হও।"

বৃদ্ধ। মা! আমার এখন ক্ষুধা তত নাই। এইমাত্র তোমার প্রসাদ খাইয়াছি। তুমি সমস্ত দিন আহার কর

নাই। আমি মরিলে ক্ষতি নাই; তোমার অভাবে সহস্র অনাথ প্রাণ হারাইবে। তুমি কি উপবাসী থাকিবে?

"আমায় উপবাস করিতে হইবে না, এখন আবার ভাত রাঁধিয়া খাইব, তুমি খাও।" বলিয়া হৈমবতী পুনঃপুনঃ বৃদ্ধকে খাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ আহার করিতে লাগিল। পুত্রের আহারের সময় মাতা যেমন সস্নেহ নয়নে কাছে দাঁড়াইয়া থাকেন, তিনিও তেমনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। যতক্ষণ বৃদ্ধের আহার না হইল, ততক্ষণ গৃহে গিয়া আর্দ্রবসনও পরিত্যাগ করিলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্ষুধিতের ক্ষুধানাশে করুণাময়ীর ক্ষুধাশান্তি।

হৈমবতীর স্বামীর নাম রেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা; পুত্রটী জ্যেষ্ঠ। রাজাপুরের অধিবাসীর মধ্যে রেবতীবাবু সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গতিপন্ন। তিনি বড় একজন জমীদারের নায়েব; মাসিক এক শত টাকা বেতন পান; সামান্য কিছু বিষয় সম্পত্তিও ছিল। রেবতী বাবু প্রায়ই বাড়ীতে থাকিতেন না, বৎসরের অধিকাংশই তাঁহাকে কার্য্যস্থানে কাটাইতে হইত। তিনি ইচ্ছা করিলে, বিস্তর অর্থ জমাইয়া বড় লোক হইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি দয়াবতী হৈমবতীর যোগ্য স্বামী। অর্থের ব্যবহার তিনি জানিতেন। অর্থ জমাইয়া ধনকুবের হইবার তাঁহার আশা ছিল না। দোল-দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধ-পার্ব্বণ, ব্রতনিয়ম, দান-ধ্যান প্রভৃতিতে তাঁহার যাহা আয়, তাহাই ব্যয় হইত।

বর্ত্তমান সময়ে দেশময় দুর্ভিক্ষ। নির্ধন কৃষিপল্লী রাজাপুর একবারে নিরুপায়। হৈমবতী স্বামীর কাছে পত্র লিখিয়াছিলেন, "কৃষকগণ অনাহারে মারা যাইতেছে, তাহাদের বাঁচিবার উপায় কি?" রেবতীবাবু উত্তর লিখিয়াছেন, "কৃষকদিগের জীবন রক্ষার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হই, তাহাও স্বীকার।

তবু দুঃখীর দুঃখ মোচনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।” রেবতীবাবু অনেক টাকার চাউল পাঠাইলেন; হৈমবতী অন্নপূর্ণারূপে ক্ষুধার্ত্তকে মুক্তহস্তে দান করিতে লাগিলেন। হৈমবতীর পিতার কিছু টাকা ছিল। তাঁহার অন্য কোন সন্তান ছিল না; মৃত্যুকালে চারি হাজার টাকা একমাত্র কন্যা হৈমবতীকে দিয়া গিয়াছিলেন। হৈমবতী সে টাকা স্বামীর কাছে দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু রেবতীবাবু জানিতেন, তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার পত্নী অর্থ-ব্যবহারে অধিকতর বুদ্ধিমতী; তিনি টাকাগুলি নিজে লইতে চাহিলেন না। সেই হইতে টাকাগুলি হৈমবতীর কাছেই ছিল। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের জীবন-রক্ষার জন্য তিনি তাহা নিঃশেষিত করিয়া ফেলিলেন। টাকায় পাঁচ সের চাউলও মিলে না; চারি হাজার টাকায় তিন শত কৃষকের কতদিন চলিবে? রেবতীবাবু পত্র লিখিয়াছেন, “আর এখন পারি না, আমি কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছি। রাজাপুর বাসীদিগের জীবন-রক্ষা হইল না।” দুই তিন দিন মনের দুঃখে হৈমবতী কেবল কাঁদিয়া কাটাইলেন। চতুর্দ্দিকে অন্নের হাহা-কার! প্রত্যহ অনাহারে লোক মারা যাইতেছে! করুণাময়ীর হৃদয়ে অসহ্য হইল। তিনি স্বামীর কাছে পত্র লিখিলেন, “তিন শত ইতর জাতির মধ্যে জগদীশ্বর আমাদিগকে উন্নত করিয়া পাঠাইয়াছেন। উন্নত ব্যক্তি পতিতকে উদ্ধার করিবে, ইহাই জগদীশ্বরের আদেশ। আমরা উন্নত হইয়া, আশ্রিত ইতর-দিগকে যদি রক্ষা করিতে না পারিলাম, তবে আমাদের কিসের মহত্ব? প্রত্যহ শত শত অনাহারীর কাতর প্রার্থনায় গৃহদ্বার পরিপূর্ণ। এ অবস্থায় জীবনধারণ করা অপেক্ষা মরণই সুখের।”

পত্নীর পত্র পাইয়া রেবতীবাবুর প্রাণ বিগলিত হইল। তিনি টাকা ধার করিয়া ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আনাইয়া পত্নীকে পাঠাইলেন। অগু সে চাউল পৌঁছিয়াছে। পনর দিন পরে অনাহার ক্লিষ্ট রাজাপুরবাসিগণ আজ অন্ন পাইয়াছে।

সমস্ত দিন ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করিয়া সাধ্বী হৈমবতী স্নান করিয়া সন্ধ্যাবেলায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহে একটী অন্নও নাই। কিন্তু তাহার মুখমণ্ডলে উপবাসের বিন্দুমাত্র চিহ্নও ছিল না। তিনি আজ অনেক ক্ষুধিতের ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করিয়াছেন; তাঁহার সম্মুখ হইতে আজ কেহ প্রার্থী হইয়া বিমুখ হইয়া যায় নাই। তাঁহার স্বামী চাউল পাঠাইয়াছেন; তাহা দ্বারা তিনি আরও পনর দিন শত অন্নহীনের জীবন-রক্ষা করিতে পারিবেন, এই আনন্দে তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়াছেন। যিনি পরের ক্ষুধার শান্তি করিতে পারেন, তাঁহার ক্ষুধার শান্তি অনাহারেই হয়।

সমস্ত দিন পরে নিজের জন্য হৈমবতী দুই মুষ্টি চাউল চড়াইয়া দিলেন। শিশু পুত্র-কন্যা দুইটী আসিয়া কাছে বসিল, আদরে তাহাদের মুখচুম্বন করিলেন। সমস্ত দিন মধ্যে তাহারা মায়ের আদর যত্ন পায় নাই। তাহাদের জননী আজ জগতের জননী হইয়া সহস্র সন্তানের প্রতিপালন করিতে নিযুক্ত। পরমানন্দে ভাইবোন্ মায়ের কাছে বসিয়া কত কথা বলিতে লাগিল।

এমন সময়ে একজন বৃদ্ধা সে গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইনি রেবতীবাবুর পিতৃস্বসা; বালিকাবয়সে নিঃসন্তানাবস্থায় বিধবা হইয়াছিলেন, চিরদিন রেবতীবাবুর সংসারেই থাকিতেন।

বৃদ্ধা আসিয়া বলিলেন, "বউ মা! এখনও পেটে দু'টী অন্ন দিলে না? দিনটা ব'য়ে যায়, মুখখানি শুকিয়ে গেছে! ধর্ম্মের জন্য সকলই দিলে, এখন প্রাণটাও কি দিবে?"

হৈমবতী অতি বিনয়ে বলিলেন, "মা! এক দিনের উপবাসে লোক মারা যায় না। ব্রত-নিয়ম ক'রে লোকে দু'দিনও অনাহারে থাকে। সাত আট দিন যাবত যা'রা অনাহারে আছে, তা'দের কি কষ্ট মা!—মা লক্ষ্মী আর কতদিনে মুখ তু'লে চাইবেন?"

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি উননে জ্বাল দিয়া ভাত নামাইলেন। উপকরণ সামগ্রী কিছুই নাই, দেখিয়া বলিলেন, "সমস্ত দিন উপবাসের পর এই শুধু ভাত কি ক'রে খাবে? এমন ক'রে কি প্রাণ বাঁচে?"

হৈমবতী। ওতেই হবে মা! যে সময় পড়েছে, তাতে দু'টী ভাত পেলেই যথেষ্ট। কত লোক ক্ষুধার জ্বালায় ঘাস খেয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে? কত লোকে পেটের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে মারা যাচ্ছে।—আহা! সাধু ঘোষের সেই সোণার প্রতিমা মেয়েটী না খে'তে পে'য়ে মারা গেল! রামদাসের ষোল সতর বৎসরের ছেলেটী পড়্‌লো আর মর্‌লো!

হৈমবতী আহার করিতে বসিলেন। লবণমাত্র উপকরণ। পুত্র কন্যা দুইটীও সঙ্গে বসিল। তাহারা দুই এক গ্রাস খাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী বিড়ালটীকে এক গ্রাস দিল। তাহা দেখিয়া বৃদ্ধা সারদাঠাকুরাণী বলিলেন, "হ্যাঁ, দেখ্‌, ছেলেমেয়ের কাণ্ডখানা! আপনি খে'তে পায় না, তা আবার বিড়ালকে দেওয়া হচ্ছে! কত মানুষ পেটের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে!"

হৈমবতী বলিলেন, "দি'ক্ মা! ওদের ওরূপ বাধা দিতে নাই। বিড়ালগুলিও আজকাল পেটপুরে খে'তে পায় না। দেখ, কত তাড়াতাড়ি খাচ্ছে! বালকবালিকাদিগকে কাউকে কিছু দিতে দেখ্‌লে বারণ করতে নাই। বারণ করলে ওদের এমন অভ্যাস হ'য়ে যায় যে, আর কখনও কাউকে কিছু দিতে পারে না। তবে অনর্থক কিছু নষ্ট করতে দেখ্‌লে অবশ্য সোম্‌ঝিয়ে দিতে হয়।"

সারদাঠাকুরাণী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তা বুঝ্‌লাম, তুমি যেমন, ছেলে-মেয়েগুলিকেও তেমন করতে চাও।—তুই মা এ কালের মেয়ে নস্। দান ক'রে আর তোমার আশা মিটে না। সমস্ত রাজ্যের রাণী হ'লেও তোমার সাধ মিটিত না। পরমেশ্বর করুন আমার রেবতী রাজা হউক, তুমি রাজরাণী হ'য়ে দানধর্ম্ম কর।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুঃসময়ের দুর্গোৎসব।

আষাঢ় মাস অন্তে রাজাপুরের অন্নকষ্ট অনেকাংশে দূর হইল। আশু ধান্য আশানুরূপ জন্মিল, কৃষকেরা দু'বেলা চারিটী অন্ন পাইয়া বাঁচিল। কিন্তু দুরবস্থা দূর হইল না। দুই বৎসরের অজন্মায় কৃষকগণ একবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। উদরান্নের কিছু সংস্থান হইল বটে, কিন্তু ভোজনের পাত্র, পরিধেয় বসন ও শয়নের শয্যা কিছুই নাই; কাহারও বা মাথা রাখিয়া দাঁড়াইবার স্থান টুকুও নাই। রোগ, পীড়া, শোক, দুঃখে গ্রাম এখনও বিষাদে হাহাকারে পরিপূর্ণ!

দয়াময়ী হৈমবতীর প্রাণ সুস্থির হইয়াছে। এখন আর অনাহারীর আর্ত্তনাদ শুনা যায় না; হৈমবতীর প্রাণে শান্তি আসিয়াছে। কিন্তু সেই দারুণ দুঃসময়ে তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও যে দুই একটী হতভাগা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের কথা মনে পড়াতে দেবীকে অনেক সময়ে মনঃকষ্ট পাইতে হয়।

পূজার অল্প পূর্ব্বে রেবতীবাবু বাড়ী আসিলেন। হৈমবতী স্বামীর দর্শন পাইয়া, পরমাহ্লাদে গত দুর্ভিক্ষের বিবরণ তাহার কাছে বলিলেন। তিনি স্বামীর সর্ব্বস্ব নিঃশেষিত করিয়াছেন, এ জন্য স্বামীর কাছে বড় কুণ্ঠিত। তাঁহার অঙ্গে

একখানিও অলঙ্কার নাই, কেবল হস্তে দুইটী-মাত্র শাঁখা আয়ো চিহ্ন রক্ষা করিতেছে।

অনেক কথার পর রেবতীবাবু হাসিয়া বলিলেন, "এখন তু কেমন সুন্দর হ'য়েছ!—যথার্থ ই যেন শ্মশানবাসী ভিখারী মহ দেবের গৃহিণী ভিখারিণী অন্নপূর্ণা!"

হৈমবতীর বড় লজ্জা হইল। অবনত মস্তকে বলিলেন "আমি তোমার সর্ব্বস্ব-নিঃশেষ ক'রেছি;—আমা হ'তে তুমি ভিখারী হ'য়ে পড়েছ। কিন্তু সহস্র অনাহারী তোমার অ জীবন পে'য়েছে। এ পুণ্যে তুমি স্বর্গের ইন্দ্রত্ব পা'বে।"

রেবতী। তুমি দান ক'রেছ, পুণ্য তোমারই হ'য়েছে তুমি স্বর্গের ইন্দ্রাণী হবে; আমি তোমার রাজসভায় একটি চাকরী নিয়ে থাক্‌ব।

হৈম। এ তোমার অন্যায় কথা। আমি কে?—দাসী মাত্র। সংসারের এক গাছি তৃণের উপরও আমার অধিকার নাই। আমি দাসী হইয়া তোমার আদেশে তোমার অর্থ ব্যয় ক'রেছি। রাজারাজাড়া নিজ হাতে কাউকে খে'তে দেন্ না, তাঁহাদের দাস দাসীতেই দেয়; তাই ব'লে কি দাস দাসীর পুণ্য হ'বে?

রেবতী। আচ্ছা, পুণ্য আমারই, তুমি এর কিছু মাত্র অংশ পা'বে না। আমি ইন্দ্রত্ব পাব, তোমার তথায় কোনও অধিকার নাই।

হৈম। তা হ'বে না। আমি তোমার দাসী, স্বর্গেও তোমার পদসেবার অধিকারিণী।

রেবতীবাবু আর কোন কথা বলিলেন না, যেন পত্নীর কাছে হারিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে

বলিলেন, "দেখ, পূজা আস্‌ছে; কিন্তু এবার আর পূজা করা সম্ভবে না।"

হৈম। তাই ত, বার্ষিক কাজটা বন্ধ করা হ'ল।—তা, মা ভগবতী যদি দিন দেন, তবে হ'বে।

রেবতী। প্রায় তিন হাজার টাকা ঋণ হ'য়েছে। আমার হাতে এখন পঞ্চাশ ষাট টাকা থাক্‌তে পারে। কিন্তু পরণের কাপড়খানি পর্য্যন্ত নাই। অন্ততঃ দশ বার টাকার কাপড়ের দরকার। কিছু জিনিষ পত্র না কর্‌লেই বা কেমন ক'রে চলে? তোমার হাতে দু'টী রূপার চুড়ীও নাই।

হৈম। তুমি ইচ্ছা কর্‌লে, পঞ্চাশ টাকায়ও পূজা হয়। নিজেদের সামান্য সামান্য কিছু কাপড় চোপড় কিনে, কোন রূপে বার্ষিক কাজটা কর্‌লে ভাল হয়। দারুণ অন্নকষ্টে দেশের লোক একবারে স্ফূর্ত্তিহীন হ'য়ে প'ড়েছে; মা দশভূজার আগমনে কিছু স্ফূর্ত্তিলাভ কর্‌তে পারে। এই দুঃসময়ের পরে তা'রা যদি বৎসরান্তরে মায়ের মুখ না দেখ্‌তে পায়, তবে আরও নিরুৎসাহ হ'বে। যা'তে পূজা হয়, তার চেষ্টা কর। এবার আর আমোদ উৎসবের প্রয়োজন নাই। কোনও রূপে মায়ের প্রতিমাখানি গ'ড়ে জলে ফুলে কাজ সারা যাবে।

হৈমবতীর যুক্তিতে রেবতীবাবু দ্বিরুক্তি করিলেন না; পূজা করিবেন স্থির করিলেন।

দেখিতে দেখিতে শরৎ-সপ্তমী আসিল। সুসময় হউক, দুঃসময় হউক, আনন্দময়ী শারদীয়ার আগমনে বঙ্গদেশ উল্লাসে

নাচিয়া উঠে; মায়ের মুখদর্শনে বঙ্গবাসী সহস্র দুঃখ ভুলিয়া যায়। মায়ের আগমনী-বাদ্য শুনিয়া রাজাপুরবাসী কৃষকগণের হৃদয়ও আনন্দে উৎফুল্ল হইল;—কিন্তু এবার তাহাদের আমোদ করিবার কিছুই নাই। তাহাদের শয়নের শয্যা নাই, পরিবার বসন নাই, পান ভোজনের পাত্র নাই; স্নেহের পুত্র কন্যাদিগকে তাহারা একখানি মোটা কাপড় কিনিয়া দিবে, এমন সামর্থ্যও তাহাদের নাই। আনন্দময়ীর আগমনে তাহারা কি লইয়া আমোদ করিবে? যাঁহার গৃহে তাহারা বৎসরান্তে মায়ের মুখ দর্শন করিয়া থাকে, তাঁহার গৃহে আজ জয়ঢাক যেন কত নিরানন্দে মৃদু মৃদু বাজিতেছে। নিরানন্দে সকলে রেবতীবাবুর বাড়ীতে দেবী প্রণাম করিতে আসিল।

হৈমবতী এবার গৃহের বাহির হইলেন না। মলিন মুখে কৃষকবালকগণ, কেহ উলঙ্গ, কেহ চীর পরিধান করিয়া ঠাকুর দেখিতে আসিয়াছে। এবার হৈমবতী দুঃখিসন্তান-দিগকে একখানি বস্ত্রও দিতে পারিলেন না; কাহারও হাতে একটু জলপান দিতে পারিলেন না; এই দুঃখে দয়াময়ী হৈমবতী গৃহের বাহির হইয়া কাহারও সঙ্গে দেখা করিলেন না। কিন্তু তাঁহাকে না দেখিয়া, কৃষকগণ গৃহে ফিরিতে চাহিল না। তাহারা শুধু দেবী দশভুজাকে প্রণাম করিতে আইসে নাই, তাহাদের জীবনদায়িনী জননীর চরণেও প্রণাম করিতে আসিয়াছে। অগত্যা হৈমবতী বাহির হইয়া সকলকে দেখা দিলেন, এবং নিতান্ত অপরাধিনীর ন্যায় বলিলেন, "বাপুসকল! এবার আমার দুঃখের দুর্গোৎসব। আশীর্ব্বাদ

কর, মা দুর্গা যদি দিন দেন, তবে আবার আমোদ উৎসব করিব।"

সকলে হৈমবতীর চরণে প্রণাম করিয়া, ভগবতীর নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া বিদায় হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুমাতার সুসন্তান।

পরিবর্ত্তন-শীল সংসারে সুখ দুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ; আলোকের পর আঁধার, আঁধারের পর আলোক; ইহাই জগতের চির-প্রচলিত নিয়ম। যে কালের বশে রাজাপুর ভীষণ শ্মশান হইয়াছিল, সেই কালের বশে আবার তাহা আনন্দের প্রমোদ-ভবন হইল। ভূমিদেবী প্রসন্না হইলেন,—হৈমন্তিক ধান্য আশানুরূপ জন্মিল। আবার শস্য-শ্যামল হইয়া রাজাপুরের মাঠ মৃদু-পবন-হিল্লোলে আনন্দে নাচিতে লাগিল। কৃষক-দিগের হৃদয় উল্লাসে ভরিয়া গেল; কৃষক-পত্নীগণ আনন্দে স্বামীর কাছে রূপার বালা চাহিল। আবার রাখাল-বালকগণ পুলকিত-চিত্তে বংশীবাদন আরম্ভ করিল।

হৈমবতীর আনন্দের সীমা নাই। তিনি দেখিতে পাইলেন, শান্তি-সঙ্গীত গাইতে গাইতে পরমানন্দে কৃষকগণ মাঠে যাইতেছে। স্বামীর ঋণ এখন পরিশোধ হয় নাই; কিন্তু দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, সেই আনন্দেই স্নেহময়ী হৈমবতী আজ শান্তিময়ী। শিশু পুত্র-কন্যা লইয়া তিনি পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন। হৈমবতীর মত মাতা কিরূপে সন্তান প্রতিপালন করেন, আমরা তাহার কিছু পরিচয় দিব।

পরের সন্তানের প্রতি যাঁহার এত স্নেহ, তাঁহার নিজ সন্তানের প্রতি স্নেহের পরিমাণ সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিমতী হৈমবতী অনুচিত স্নেহ বশতঃ কখনও পুত্র কন্যার স্বেচ্ছাচারিতা বা বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন না।

রাজাপুরের মাঠে পৌষসংক্রান্তির সময়ে বাস্তুদেবের মেলা হইত। রাজাপুরের জমীদার এই মেলা মিলাইতেন। হৈমবতীর পুত্র হরিদাস রামধনের সঙ্গে মেলা দেখিতে গিয়াছিল। তথায় সে দেখিতে পাইল, জমীদার মহাশয়ের একটী ছোট পুত্র, সুন্দর একটী সাটিনের জামা গায় দিয়া মেলা দেখিতে আসিয়াছে। বালক হরিদাসের তেমনি একটী জামা পরিতে সাধ হইল। বাড়ী আসিয়া মায়ের কাছে বায়না করিল, তাহাকে তেমনি একটী জামা কিনিয়া দিতে হইবে। হৈমবতী বলিলেন, "হরিদাস! তোমার যে কয়টী জামা আছে, সব যদি আজ আমায় দিতে পার, তবে কাল তোমায় তেমনি একটী জামা কিনে দিব।"

হরিদাস ইহাতে সম্মত হইল। গায়ের থেকে জামা খুলিয়া মায়ের কাছে দিল। মাতা সেগুলি নিয়া বাক্‌সে আটক করিলেন। ক্রমে রাত্রি আসিল। পৌষের ভয়ঙ্কর শীত; হরিদাসের গায়ে কোট জামা কিছুই নাই। শুধু র‍্যাপারে আর শীত মানাইতেছে না। শীত সহ্য করিতে না পারিয়া মায়ের কাছে গিয়া বলিল, "মা! বড় শীত কচ্ছে; আজ আমায় জামাগুলি গায়ে দিতে দাও, কাল যখন নূতন জামা কিনে দেবে, তখন সমস্ত খুলে দেব।"

হৈম। কেন বাবা! তোমার গায়ে র‍্যাপার আছে; কাল সাটিনের জামা পা'বে, আজ শীত কিসের?

হরি। না, মা! বড় শীত কচ্ছে।

হৈম। তোমার গায়ে গরম কাপড় আছে, তা'তেও শীত কচ্ছে; আর যা'দের পরণের কাপড়ও নাই তা'দের কি হচ্ছে বাবা! বল দেখি, এখন নিমাই বৈরাগীর ছেলেমেয়েরা কি ক'রে আছে! তখন ত দেখে ছিলে, তা'দের কোমরে একখানি ছেড়া ন্যাক্‌ড়া মাত্র জড়ান।

হরি। হ্যাঁ মা, তা'দের বড় কষ্ট। এত শীতে খালি গায়ে কি ক'রে আছে?

হৈম। আচ্ছা, এখন বল দেখি, তোমার সাটিনের জামার দরকার অধিক?—না তা'দের একখানি মোটা চাদরের দরকার অধিক?

হরি। তা'রা এখন একটী মোটা চাদর পে'লে কত খুসী হয়!

হৈম। তুমি সাটিনের জামা না পে'লে, তোমার কি শীতে কষ্ট পে'তে হয়?

হরি। না মা, আমার শীতে কষ্ট নাই। আমার যে জামাগুলি আছে, তা'তে শীত মানায়।

হৈম। তবে নিজে সাটিনের জামা পরার চেয়ে, ওদের দু'টী মোটা চাদর কিনে দেওয়া কি অধিক সুখের নয়?

হরি। যথার্থ মা, ওদের দু'টী চাদর দিতে পার্‌লে ওদের বড় উপকার হয়। আমি সাটিনের জামা চাই না, ওদের তুমি দু'টী চাদর দিও।

আনন্দে হৈমবতী পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন, এবং বাক্স খুলিয়া তাহার জামা বাহির করিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে দু'টী টাকা হরিদাসের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই দু'টী টাকা দিয়ে কাল মেলায় থেকে দুইটী চাদর কিনে, তুমি নিমাই বৈরাগীর ছেলে-মেয়েকে দিয়ে এস।"

পুত্র কন্যার হস্তে দিয়া দান করা ভাল; ইহাতে তাহারাও দান করিতে শিখে।

আর এক দিন হৈমবতী কন্যা বিরজাকে মুড়ি কিনিতে একটী পয়সা দিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরের মেয়ে বিরজা পয়সাটী কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর মায়ের কাছে আসিয়া আর একটী পয়সা চাহিল। মাতা সে দিন কন্যাকে জলখাবার জন্য কিছুই দিলেন না। বলিলেন, "সেই পয়সাটী খুঁজে নাওগে. নচেৎ আর কিছুই পাবে না।"

বিরজা কাঁদিয়া ঠাকুর-মা সারদাঠাকুরাণীর কাছে বলিল। সারদাঠাকুরাণী হৈমবতীকে বলিলেন, "বউ মা! ছেলেমানুষ পয়সাটী হারিয়ে ফেলে'ছে, ওকে আর একটী পয়সা দাও। তোমার বস্ত কত পরে খেয়ে বাঁচ্ছে।"

হৈমবতী বলিলেন, "মা! ওতে ছেলেপিলেদের অপব্যয়ে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। একটী পয়সা তুচ্ছ কথা বটে; কিন্তু ঐরূপ এক আধ পয়সা হারিয়ে ফেল্‌তে ফেল্‌তে, শেষে ওরা পয়সা কড়ির মূল্য বুঝতে পারে না।"

অন্য পয়সা কিছুতেই দিলেন না। যে'টী হারাইয়া ফেলিয়াছিল, সেইটী খুঁজিয়া আনিয়া বিরজাকে দিলেন।

পুত্র কন্যা যদি কখনও গল্প শুনিবার জন্য আব্দার করিত, তখন তিনি রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, সীতা দময়ন্তীর পতিভক্তি, হরিশ্চন্দ্র রাজার সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি পুরাণের সুন্দর সুন্দর গল্প বলিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। নিজে আমোদ ছলেও কখন পুত্র কন্যার কাছে মিথ্যা কথা বলিতেন না।—পাছে তাহাদেরও মিথ্যা বলিতে অভ্যাস জন্মে।

হৈমবতী সারদাঠাকুরাণীর ফুল তুলিবার ভার পুত্র কন্যার উপর দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "সূর্য্যোদয়ের পর ফুল তুলিলে, সে ফুলে পূজা হয় না।" বালকবালিকারা যাহাতে সকালে গাত্রোত্থান করিতে শিখে, তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। শৈশব হইতেই যাহাতে পুত্র- কন্যা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি করিতে শিখে, তজ্জন্য তিনি শয়নকালের ও শয্যা-ত্যাগ করিবার কালের দুইটী ঈশ্বর-মহিমা-শ্লোক রচনা করিয়া তাহাদিগকে শিখাইয়াছেন। হরিদাস ও বিরজা দুই জনে সমস্বরে যখন কবিতা দু'টী পড়িত, তখন বড় মধুর লাগিত।

সাধ্বী জননীর শিক্ষার গুণে সন্তান দুইটীও কেমন শিক্ষিত হইয়াছে দেখ,—এক দিন বিরজা কয়েকটী প্রতিবেশী বালক-বালিকার সঙ্গে ছুটাছুটি খেলিতেছিল। সকলে মিলিয়া এক-সঙ্গে ছুটিল। ছুটিবার সময়ে বিরজার পায়ের আঘাত লাগিয়া তাহার সমবয়স্ক একটী বালক পড়িয়া গেল। পড়িয়া গিয়া বালকটী একটু বেদনা পাইল, এবং কাঁদিয়া উঠিল। বিরজাও তাহার সঙ্গে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহাদের কান্না শুনিয়া হৈমবতী আসিয়া আহত বালকটীকে কোলে তুলিয়া লইলেন,

এবং সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিলেন। বালক শান্ত হইল। তখন হৈমবতী বিরজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিরজা! তুই কাঁদ্‌লি কেন?"

বিরজা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "আমি বিপিনকে ফেলে দিয়েছি, ওর বড় ব্যথা লেগেছে।—বিপিন! আমি দেখ্‌তে পাইনি; তুমি রাগ ক'র না।"

পুলকে হৈমবতী কন্যার মুখচুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, "বিরজা! বড় হ'য়েও যেন পরস্পর এমনি ভাব থাকে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিপদ—সাধুর পরীক্ষা।

জগদীশ্বরের লীলা বুঝা ভার। ধর্ম্মের পুরস্কার তিনি লোককে সহজে দেন না। সাধ্বী হৈমবতী অধিক দিন সুখে কাটাইতে পারিলেন না। তাঁহার এই বুকভরা আনন্দের সময়ে একটী ভয়ঙ্কর আকস্মিক্ বিপদ ঘটিল।

এক দিন বসন্তকালের অপরাহ্নে হৈমবতী পুত্রকন্যা দুইটী সঙ্গে লইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র উদ্যানটীর মধ্যে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। উদ্যানটী তাহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত। তাহার এক পার্শ্বে সিম্, বেগুণ, কলা, কচু, লাউ, কুম্ড়া প্রভৃতি নানাবিধ শাক্ সব্জীর গাছ; একপার্শ্বে আম, জাম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি কয়েকটী ফলের গাছ, এবং অন্যপার্শ্বে গোলাপ, গন্ধরাজ, করবী প্রভৃতি কতগুলি ফুলের গাছ বিলক্ষণ সুন্দর রূপে সাজাইয়া রোপিত হইয়াছে। হৈমবতী পুত্রকন্যা সঙ্গে কোনও গাছে জলসেক করিতেছেন, কোনও গাছের মূলের কু তৃণগুলি তুলিয়া ফেলিতেছেন, কোনওটীর মূল কিছু মাটী দিয়া ঢাকিয়া দিতেছেন; কোনও গাছের পাকা ফলটী তুলিয়া লইতেছেন, কোনওটীর শুষ্ক ডালটী ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন, প্রয়োজনমত কোনও নিষ্ফল গাছ তুলিয়া

ফেলিতেছেন। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষসমূহ ফুলফলে অবনত হইয়া ধীর সমীরণে ঈষৎ পরিদোলিত হইতেছে; প্রফুল্ল-কুসুম স্তবক হইতে মনোহর সুগন্ধ বিস্তীর্ণ হইয়া উদ্যান-স্থল আমোদিত করিতেছে; পত্রান্তরালে বসিয়া দয়েল, কোকিল প্রভৃতি পক্ষিগণ শ্রুতি-মধুর কূজন করিতেছে।—বালিকা বিরজা থাকিয়া থাকিয়া কোকিলের স্বরে ব্যঙ্গ করিয়া "কুহু কুহু" শব্দ করিতেছে;—দূরে রাখালগণ অশ্বত্থমূলে বসিয়া পরমানন্দে গোষ্ঠ-গীত গাইতেছে; ধেনু-বৎসগণ নবতৃণ ভক্ষণে পরমানন্দে রোমন্থন করিতেছে। সারি সারি বলাকা-শ্রেণী উড়িতেছে, পড়িতেছে।—জগৎ নির্ম্মল শান্তিময়।

কিন্তু হৈমবতীর অন্তরে আজ তত শান্তি নাই। দশ বার দিন হইল, রেবতীবাবু পত্র লিখিয়াছেন, 'তাঁহার জ্বর হইয়াছে।' তাহার পর অদ্যাপি কোনও সংবাদ আসিল না; তাই পতি-প্রাণা হৈমবতী বড় চিন্তাকুল। বোধ হয়, তাঁহার পীড়া বাড়িয়াছে; নইলে আরোগ্য-সংবাদ লিখেন না কেন? হৈমবতী নিতান্ত অন্যমনে, ভাবিতে ভাবিতে উদ্যানের যত্ন করিতেছেন। মনের ভুলে কখনও তৃণ তুলিতে গাছ তুলিতেছেন, ফল তুলিতে ফুল তুলিয়া ফেলিতেছেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন কোনও ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার মনঃপ্রাণ ভারাক্রান্ত হইতেছে।

শূন্য-মনে হৈমবতী চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন; এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, দূরে রাস্তার উপর দিয়া চারি জন বাহক একখানি পাল্কি লইয়া তাঁহার বাড়ীর দিকে আসিতেছে। বিরজা পাল্কি দেখিয়া বলিল," দাদা! দেখ, বর আস্‌ছে।"

হরিদাস বলিল, "দূর বোকা! বর হ'লে বাজ্-বাজনা থাক্‌ত না? কোনও বাবু আস্‌ছেন!" পাল্কি দেখিয়া হৈমবতীর প্রাণ চমকিয়া উঠিল। তিনি নীরবে অনিমিষ-লোচনে পাল্কির পানে তাকাইয়া রহিলেন। বাহকেরা নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি দেখিতে পাইলেন, তাহাদের পশ্চাতে তাঁহার স্বামীর ভৃত্য ছুটিয়া আসিতেছে। দেখিবামাত্র তাঁহার বক্ষঃস্থল দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! কি করিবেন? কি বলিবেন? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হৈমবতী বিহ্বলা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে বাহকেরা পাল্কি লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্য ডাকিল, "মা ঠাকুরাণি! এ দিকে আসুন।"

হৈমবতী ছুটিয়া আসিলেন, দেখিলেন, তাঁহার স্বামী জীর্ণ-শীর্ণ-দেহে প্রায় অজ্ঞানাবস্থায় পাল্কির মধ্যে শায়িত। তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম ছুটিল। ভৃত্য আশ্বাস-বাক্যে বলিল, "ছি মা! এমন হচ্ছেন কেন? চিন্তার কোন কারণ নাই, শীঘ্র ঘরে বিছানা করুন।"

কাঁদিতে কাঁদিতে হৈমবতী শয্যা প্রস্তুত করিলেন। ভৃত্য কোলে করিয়া রেবতীবাবুকে গৃহে তুলিয়া শয্যার উপর রাখিল।

রেবতীবাবুর কঠিন পীড়া, সান্নিপাতিক-বিকার; দশ বার দিন চিকিৎসা করিয়া কিছুমাত্র উপশম হয় নাই। অবস্থা মন্দ দেখিয়া কার্য্যস্থানের লোকেরা নৌকা বাহক দিয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। হৈমবতী স্বামীর চিকিৎসার জন্য বৈদ্য আনিতে পাঠাইলেন। পল্লীগ্রামে সচরাচর ভাল চিকিৎসক

পাওয়া দুষ্কর। রাজাপুরের নিকটবর্ত্তী অন্য একটী গ্রামে এক জন অল্প-শিক্ষিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার দ্বারাই রেবতীবাবুর চিকিৎসা হইতে লাগিল।

পত্নীর প্রাণপণ যত্নে রেবতীবাবুর জীবন-রক্ষা হইল বটে, কিন্তু জীবনের প্রধান-অঙ্গ চক্ষু দুইটী হারাইলেন। অত্যধিক-পরিমাণে বিষাক্ত ঔষধ সেবন করাতে রেবতীবাবু একেবারে দৃষ্টি-শক্তি-হীন হইয়া পড়িলেন।

সাধ্বী হৈমবতীর দুঃখের সীমা নাই। স্বামীর চক্ষু-চিকিৎসার জন্য অশেষবিধ যত্ন করিলেন। বিষয়-সম্পত্তি, বসন-ভূষণ প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া, এক বৎসরকাল কলিকাতার সুদক্ষ ডাক্তারের দ্বারা স্বামীর চিকিৎসা করাইলেন। কত দেব দেবীর কাছে কত রকম মানস করিলেন, কিন্তু কোন দেবতাই হৈমবতীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন না।

হায়! ধর্ম্মের পুরস্কার কি এই? দয়াময়ী হৈমবতীর অন্নদানের প্রতিফল কি এই? স্বামী দৃষ্টি-হীন!—পতি প্রাণা হৈমবতীও বুঝি কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ হইবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিপদে ধৈর্য্যই মহত্ত্ব।

রেবতীবাবুর সুখের সংসার বিষাদময় হইল। নিজে অন্ধ, একস্থান হইতে স্থানান্তর যাইবার শক্তি নাই। তাঁহার পূর্ব্ব-সঞ্চিত যে কিছু অর্থাদি ছিল, তাহা বিগত দুর্ভিক্ষে ব্যয়িত হইয়া আরও কিছু ঋণ হইয়াছিল। তাহার পর যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাও চিকিৎসার জন্য নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। বিষয়-সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহাও দেনার জন্য মহাজনের নিকট আবদ্ধ। রেবতীবাবু এখন নিরুপায়! যাঁহারা অজস্র অন্নদান করিয়া শত শত লোকের জীবন-রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাঁহাদের অন্নের সংস্থান নাই!

তবে রাজাপুরবাসী কৃষকেরা অকৃতজ্ঞ নয়। তাহারা যথাসাধ্য তাহাদের অন্নপূর্ণা মা হৈমবতীর সাহায্য করিতে ত্রুটী করিতেছে না। সকলেই প্রয়োজনমত দ্রব্যাদি দান করিয়া হৈমবতীর সাহায্য করিতেছে। এ জন্য রেবতীবাবুর পুত্রকন্যাকে অন্নের কষ্ট পাইতে হয় না; কোনরূপে দু'বেলা দু'সন্ধ্যা আহারের সংস্থান এক রকম হইতেছে। যিনি এক সময়ে মুক্ত-হস্তে দান করিয়াছেন, তিনি আজ ভিখারী! সময়ের পরিবর্ত্তন কে বুঝে?

কিন্তু এরূপভাবে ক'দিন চলিতে পারে? পরে কত দিন সাহায্য করিতে পারে? সংসারটীও নিতান্ত কম নয়, দুইটী ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধা পিতৃস্বসা, নিজেরা দু'জন, ভৃত্য একজন; ক্রমে কষ্ট হইতে লাগিল। এক দিন হৈমবতী স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ভৃত্য রামধনকে বলিলেন, "রামধন! তুমি আর এখানে থেকে কষ্ট পাবে কেন? বেতনাদি পাইবার আশা ত নাই, দু'বেলা পেটপূরে খে'তে পাবে এমন আশাও নাই। তুমি অন্য চেষ্টা দেখ।"

রামধন বহুকালের ভৃত্য! হৈমবতীকে মাতার অধিক ভক্তি করিত, হরিদাস ও বিরজাকে সহোদরের অধিক ভালবাসিত। হৈমবতীর কথা শুনিয়া সে বলিল, "মা! আমি তোমার অনেক লুণ খেয়েছি। চাকরের মত আমি তোমার বাড়ীতে থাকি নাই, আপন বাড়ীতে মায়ের কাছে থাকার ন্যায় তোমার কাছে এই বার বছর আছি। তোমার এই দুরবস্থার সময়ে যদি আমি ছেড়ে যাই, তবে আমার ধর্ম্মে কি বল্‌বে মা? আমি না থাক্‌লে তোমাদের আর উপায় নাই; কে তোমাদের হাট বাজার ক'রে দেবে? হরিদাস বিরজাকে কে যত্ন কর্‌বে?—মা! আমি এখন কিছুই চাই না; খেতে না পাই, তোমাদের যে ভাবে যাবে, আমারও সেই ভাবে যাবে। আমি মা! কোথাও যাব না। আমার ছেলে মেয়ের খেতে পর্‌তে কোনও কষ্ট নাই; আমার পয়সা কড়ি না হ'লে চল্‌বে। আমার এই শেষকাল; যত দিন থাকি, তোমার পদসেবা করেই যা'ব।"

রামধনের কথা শুনিয়া হৈমবতীর কান্না আসিল; তিনি আর কোনও কথা বলিবেন না।

হৈমবতী ভাগ্যবানের দুহিতা ও ভাগ্যবানের গৃহিণী ছিলেন অভাব দুঃখ তিনি কখনও জানিতেন না; কিন্তু তিনি কখন বিলাসিনী বা পরিশ্রম-বিমুখ ছিলেন না। তাঁহার যখন সুসময় ছিল, তখন তিনি স্বহস্তে সমস্ত গৃহ-কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন চিরাভ্যস্ত-পরিশ্রম-গুণে তাঁহার শরীরে সামর্থ্যও যথেষ্ট ছিল দুঃসময়ে পড়িয়া এখন তিনি দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়াও কাতর হন না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার অন্ধ স্বামী, স্বামীর বৃদ্ধা পিতৃষ্বসা, নিজের দু'টী শিশু সন্তান, সকলেরই রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার একার উপর। বিপদে অধীর হইয়া, কেবল চিন্তা করিলে তাঁহার চলিবে না। সংসারে তাঁহার কাজ অনেক। অন্ধ স্বামীর সেবা করিতে হয়, তাঁহাকে স্নান করাইতে হয়, আহার করাইতে হয়, প্রয়োজনমত হাতে ধরিয়া স্থানান্তরিত করিতে হয়। বৃদ্ধা সারদাঠাকুরাণী এখন একরূপ অচল, তাঁহারও যথোচিত সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়। শিশু পুত্র-কন্যার লালন-পালন করিতে হয়। সংসারের অনাটন জন্যও তাঁহাকে ভাবিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন তাঁহার আর একটী বিশেষ অশান্তির কারণ হইয়াছে। সারদাঠাকুরাণী পূর্ব্বে বড় ভাল লোক ছিলেন, হৈমবতীকে তিনি কন্যার ন্যায় ভাল বাসিতেন। কিন্তু অতিরিক্ত বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত ও নানাবিধ মনঃকষ্টে তিনি এখন একরূপ সংজ্ঞাহারা হইয়াছেন, তাঁহার স্বভাব অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। কারণে হউক, অকারণে হউক, তিনি সর্ব্বদাই হৈমবতীকে নানা রকম বাক্য যন্ত্রণা দিতেন। তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় সামান্য একটু ত্রুটী বা বিলম্ব হইলে, তিনি

হৈমবতীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতেন। হৈমবতী অবনত-মস্তকে নীরবে সে সব সহ্য করিতেন। সারদাঠাকুরাণীর এইরূপ কর্কশ-ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া রেবতীবাবু এক দিন বলিলেন, "পিসী মা! এ তোমার বড় অন্যায়!—দেখ্‌ছ একা মানুষ, এত যন্ত্রণা কি ক'রে সয়? একটু বিবেচনা ক'রে বল্‌তে হয়।" ইহাতে হৈমবতী স্বামীকে বলিলেন, "ঠাকুরাণীকে ওরূপ বলিও না। এখন আর ওঁর তেমন বুদ্ধিশুদ্ধি নাই। বুড়া হ'লে লোকের এমন হ'য়েই থাকে। ওঁর কথা ধর্‌তে নাই। ওঁর দোষ কি?—আমার অদৃষ্টের দুঃখ, তা কে খণ্ডা'বে?"

হৈমবতী এই সমস্ত কর্ম্ম করিয়া যখন অবসর পাইতেন, তখন ছুঁচ-সূতার কাজ করিতেন। উলের কাজ তিনি খুব ভাল জানিতেন। কাঁথা কম্ফের্টার, মোজা, পৈতা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া, তাহা বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন! বাড়ীতে তিনি লাউ, কুমড়া, আলু, বেগুণ প্রভৃতি শাক্ সব্জী প্রস্তুত করিয়া প্রয়োজনীয় তরকারী সংগ্রহ করিতেন, এবং মাঝে মাঝে তাহার কতকাংশ রামধনের দ্বারা বাজারে বিক্রয় করিয়া, তৈল, লবণ কিনিয়া আনিতেন। এ সমস্ত কাজে তিনি কিছুমাত্র গ্লানি-বোধ করিতেন না।—অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা।—স্বামী পুত্রের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য যিনি প্রাণ পর্য্যন্তও দিতে কুণ্ঠিত নন্; সামান্য অভিমান তাঁহার কাছে অতি তুচ্ছ।

এক দিন হৈমবতী সমস্ত গৃহ-কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া রাত্রিতে একটী মোজা প্রস্তুত করিতেছিলেন। রাত্রি তখন অনেক

হইয়াছে, প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত। তখন কি কারণে সারদাঠাকুরাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, এত রাত্রিতেও হৈমবতী নিদ্রা যান নাই। দেখিয়া বলিলেন, "বউ! রাত্রি প্রায় ভোর হ'তে যায়, এখনও ঘুমলে না! এমন কর্‌লে ক'দিন বাঁচ্‌বে মা?"

হৈমবতী বলিলেন, "তা কি করি? ঘরে লুণ তেল কিছুই নাই। আজ মোজাজোড়া তৈয়ারী হ'লে কাল কিছু পয়সা হ'তে পারে।"

সারদা। আঃ! পোড়া বিধাতা! যা'র অন্নে শত শত লোকের প্রাণরক্ষা হ'য়েছে, তা'রই আজ লুণ তেলের পয়সা যুটে না!—তা, বউ! সে দিন কাছারীর নায়েব তোমার কষ্ট দেখে, টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তা লওয়া ভাল ছিল। এমন সময়ে আর মান অভিমান কি?

হৈম। আমি মানের জন্য যে সেই দান লই নাই, তাহা নয়। নায়েব মহাশয় যে আমার দুঃখ দেখে আমাকে সাহায্য কচ্ছেন, আমার মনে সেরূপ বিশ্বাস হ'ল না। লোকটা তেমন প্রকৃতির নয়। হারাণদাসের মেয়ে, বেচারী মালিনীকে এইরূপ মাঝে মাঝে টাকা কড়ি, কাপড় চোপড় দিয়ে সাহায্য ক'র্‌ত, শেষে হতভাগিনীর সর্ব্বনাশটা কল্লে!—গরীব হারাণদাসের জাতটা মাল্লে!—মা! স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম আর ক্যাচ সমান, একটু ঘা লাগ্‌লেই চূর্ণ হ'য়ে যায়, বড় সাবধানে রাখ্‌তে হয়। বরং অনাহারে মরণ মঙ্গল, তবু কুলোকের সাহায্য লইতে নাই। আমি সব হারাইয়েছি, কেবল ধর্ম্মের উপর ভর ক'রেই আছি।

সারদা। কি জানি মা, ধর্ম্ম ত কিছুই বুঝ্‌লাম্ না। কলিতে ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই নাই! বিধাতার বিচার নাই! যদি ধর্ম্ম-কর্ম্মের বিচার থাক্‌ত, তা হ'লে কি তোমার এত কষ্ট হ'ত? ধর্ম্মের কপালেও আগুন! বিধাতার কপালেও আগুন!

হৈম। বিধাতার দোষ নাই মা, আমার অদৃষ্টের ভোগ। পূর্ব্ব-জন্মে কি মহাপাপ ক'রে এসেছি, তাই তার ফলভোগ কচ্ছি। জগতে কেউ মা, চির-সুখী হ'তে পারে না। আমি ত কোন্ ছার!—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি দেব-কন্যারা,—যা'দের নাম কর্‌লে আমাদের পাপ দূর হয়, তাঁ'রাও কত কষ্টভোগ করেছিলেন। ঈশ্বর বিপদে ফেলে মানুষকে পরীক্ষা করেন। যে ব্যক্তি বিপদে প'ড়েও ধর্ম্মত্যাগ না করে, সেই প্রকৃত মানুষ, সেই ঈশ্বরের করুণালাভ কর্‌তে পারে। আগুনে পোড়াইলে যে সোণা খাঁটি থাকে, তাই প্রকৃত সোণা, লোকে তা'রই আদর করে।

শুনিতে শুনিতে সারদাঠাকুরাণী ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া হৈমবতীও ঘুমাইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সন্তানের প্রতিপালন অপেক্ষা শিক্ষাদান গুরুতর।

দুঃখে কষ্টে দিন যাইতে লাগিল। হৈমবতীর দুঃখের দিন অবসান হইল না। তাঁহার অদৃষ্টাকাশে দুঃখের মেঘ ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতে লাগিল। রেবতীবাবুর অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতে লাগিল। নিজে অন্ধ, সংসারের এই দুরবস্থা, তাঁহার প্রাণ-প্রিয়া পত্নী হৈমবতীর এই অসীম দুঃখ, প্রাণাধিক পুত্রকন্যার এত কষ্ট, এই সমস্ত চিন্তায়, মানসিক কষ্টে রেবতীবাবুর শরীর অস্থি-চর্ম্ম-সার হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাঁহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অভাগিনী হৈমবতীর হাতের শাঁখা দুইটীও যে অধিক দিন বজায় থাকে, সেরূপ আশা নাই।

ইহার উপর হৈমবতীর আর এক চিন্তা আসিয়া পড়িল। হরিদাসের বয়স ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা করা উচিত। সন্তানকে অশিক্ষিত রাখিলে, পিতা-মাতাকে পরলোকে নরকগামী হইতে হয়। কিন্তু কাঙ্গালিনী হৈমবতী সন্তানের দুই সন্ধ্যা অন্ন যোগাইতে অক্ষম,—অর্থব্যয় করিয়া পুত্রের শিক্ষা-বিধান করিবেন কিরূপে?

হৈমবতী নিজেই পুত্রকন্যার অক্ষরপরিচয় করাইয়া তাহা-দিগকে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখাইলেন। কিন্তু নিজে

ভাল লেখাপড়া জানিতেন না; সুতরাং হরিদাসকে ভাল শিক্ষকের নিকট রাখা আবশ্যক হইল। রাজাপুরে তেমন কোনও ভাল বিদ্যালয় ছিল না। এক জন অল্প-শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পাঠশালা করিয়া গ্রাম্য বালকদিগকে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখাইতেন। রেবতীবাবু এক দিন উক্ত গুরুমহাশয়কে ডাকাইয়া নিতান্ত কাতরভাবে বলিলেন, "মহাশয়! আমার ন্যায় হত-ভাগ্য লোক সংসারে আর নাই। পুত্র-কন্যা দুইটীকে দু'সন্ধ্যা দু'টী অন্ন দিয়ে প্রতিপালন করি, এমন সাধ্যও আমার নাই। ছেলেটীর শিক্ষার সময় অতিক্রান্ত হ'য়ে যাচ্ছে। আপনি যদি অনুগ্রহ-প্রকাশ করিয়া এ দরিদ্রের সন্তানটীকে মানুষ ক'রে দেন, তবে চিরকাল আপনার ঋণী হ'য়ে থাক্‌ব।" হৈমবতী বলিলেন, "ঠাকুর! আপনি আমার পিতৃস্থানীয়। আমার হরিদাসকে আপনার হাতে সঁপিয়া দিলাম। নিতান্ত দীন-হীন নিরাশ্রয় বালক ব'লে, ওর উপরে একটু দয়া কর্‌বেন। আমি আপনাকে মাসে মাসে দুইটী পৈতা প্রস্তুত ক'রে দিব।"

গুরুমহাশয় হৈমবতীকে যথেষ্ট আশ্বাস-বাক্য বলিয়া হরি-দাসের শিক্ষাভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পল্লীগ্রামের গুরু-মহাশয়েরা বড় ভয়ানক প্রকৃতির লোক। ছাত্রদিগের লেখা-পড়া যত হউক, আর না হউক, তাহাদিগকে শাসন করিতে গুরুমহাশয়েরা বড়ই দক্ষ! ছাত্রগণ গুরুমহাশয়ের মনোমত খরচা ও সিদাপত্র প্রভৃতি দিতে পারিলেই গুরুমহাশয়ের প্রিয় হইতে পারে; অন্যথা নির্দ্দয় বেত্রাঘাতে তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বদাই লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হয়! অনেক সময়ে

ছাত্রগণ গুরুমহাশয়ের অনুরোধে গৃহের ধান, চাল, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি চুরি করিয়া অভিভাবকের কাছে প্রহার ও তিরস্কার ভোগ করে। দুর্ভাগ্য হরিদাস দরিদ্রের ছেলে, সকল দিন তাহার অন্ন যোটে না; গুরুমহাশয়ের মনোমত উপঢৌকন যোগাইবে কিরূপে? বিশেষতঃ হরিদাস অবৈতনিক ছাত্র; গুরুমহাশয় তাহার নিকট হইতে বাজে আদায় করিয়া পোষাইয়া লইবার চেষ্টা করেন। এজন্য প্রায় প্রত্যহই হরিদাস গুরুমহাশয় কর্তৃক উৎপীড়িত হইত। কিন্তু সুবোধ বালক, এজন্য মায়ের কাছে কখনও আব্দার করিত না। সে জানিত, তাহার কাঙ্গালিনী জননী সকল দিন ভালরূপে তাহার ক্ষুধার অন্ন যোগাইতে পারেন না, তাঁহার কাছে আব্দার করা তাঁহাকে যন্ত্রণা দেওয়া মাত্র; নীরবে গুরুমহাশয়ের উৎপীড়ন সহ্য করিত। দশম-বর্ষীয় বালকের এত বুদ্ধি!—না হইবে কেন? সাক্ষাৎ দেব-বালা হৈমবতীর গর্ভে তাহার জন্ম;—অমৃতবৃক্ষে অমৃত-ফলই ফলে।

হরিদাসের ভাগ্যে গুরুমহাশয়ের নিকট শিক্ষালাভ করা আর অধিক দিন যুটিল না। তাহার একটী গুরুতর কারণ ঘটিল। হরিদাসের বয়স এই একাদশবর্ষ অতিক্রান্ত হইতে চলিল। নবমবর্ষে ব্রাহ্মণের ছেলের উপনয়ন দেওয়া কর্ত্তব্য; অগত্যা একাদশবর্ষে পুত্রের উপনয়ন-কাল অতীত হইয়া যায় দেখিয়া, হৈমবতী কেবলমাত্র পুরোহিত ডাকিয়া তাহার উপনয়ন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তিনি বড় আশা করিয়াছিলেন, মনের মত আমোদ উৎসব করিয়া হরিদাসের উপনয়ন দিবেন; আত্মীয়

কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিবেন, সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইবেন; কিন্তু মানুষের কয়টী আশা সফল হইয়া থাকে?— লক্ষ্মী-রূপিণী জানকী আশা করিয়াছিলেন, পুত্র কোলে লইয়া কত আনন্দে সিংহাসনে স্বামীর বামে বসিবেন; কিন্তু তাঁহাকে নির্জ্জন-অরণ্যে, ভিখারীর কুটীরে পুত্র প্রসব করিতে হইয়াছিল! সরলা বনবালা শকুন্তলা আশা করিয়াছিলেন, চিরকাল স্বামীর সিংহাসন-তলে বসিয়া স্বামীর পদসেবা করিয়া প্রণয়তৃষ্ণা মিটাইবেন; কিন্তু তাঁহাকে বিরহানলে দগ্ধ হইয়া, বনে বনে ফিরিতে হইয়াছিল! আশার পরিণাম অনেক স্থলেই এইরূপ। ভিখারীর সন্তান হরিদাসের উপনয়ন-ক্রিয়া ফুলে জলে সম্পন্ন হইল। কিন্তু গুরুমহাশয় চিরকাল আশা করিয়াছিলেন, এতদিন যাহাই হউক, উপনয়নের সময়ে অবশ্য হরিদাস তাঁহাকে কিছু উপহার দিবে। ফলে, আশা বিফল হইল; হরিদাস গুরুমহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিতে পারিল না। গুরুমহাশয় ইহাতে আপনাকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিলেন, এবং চটিয়া আগুন হইয়া রহিলেন। পরে হরিদাস যখন একটী পৈতা তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিল; তখন তিনি রাগে মুখ বিকৃতি করিয়া পৈতাটী দূরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং হরিদাসকে তাঁহার বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে হরিদাস মায়ের কাছে গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

সাধু দুরবস্থায়ও ধর্ম্মে অটল।

রাজাপুরের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোহর। স্বচ্ছ-সলিলা নদী, শস্য-শ্যামল-ক্ষেত্র, ফল-পুষ্প-ভারাবনত বৃক্ষ প্রভৃতিতে রাজাপুর সর্ব্বদাই শোভামান। দূরদেশ হইতে অনেক বড়লোক এই কৃষকপল্লীর শোভা দেখিতে এস্থানে আগমন করিতেন। কলিকাতা-নিবাসী এক জন ধনী যুবক বসন্তকালে রাজাপুরে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। দৈব-দুর্ঘটনায় রাজাপুরে আসিয়া তিনি কঠিন বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইলেন। সঙ্গে একমাত্র ভৃত্য আসিয়াছিল; ওলাউঠা সংক্রামক রোগ ভাবিয়া সে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। একে বিদেশ, তাহাতে আত্মীয়-বান্ধব, লোক-জন কিছুমাত্র সঙ্গে নাই; কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া ভদ্রলোক কাতরভাবে অনেকের গৃহে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ওলাউঠা ভয়ানক সংক্রামক রোগ; বিশেষতঃ অশিক্ষিত কৃষকগণ অত্যন্ত কু-সংস্কারাপন্ন! প্রাণভয়ে কেহই নিরুপায় ভদ্রলোকটীকে আশ্রয় দিতে চাহিল না। পীড়ার দারুণ যন্ত্রণায় ভদ্রলোকটী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া গেল। জীবনে নিরাশ হইয়া, নিরাশ্রয়া-বস্থায় রাস্তায় পড়িয়া তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাস্তা দিয়া যাহারা যাইতেছিল, তাহারা ভয়ে তাঁহার কাছ দিয়া না গিয়া, অন্যপথে সরিয়া গেল। নিদারুণ পিপাসার যন্ত্রণায় ভদ্রলোকটী পথিকদিগের কাছে কাতর-কণ্ঠে এক বিন্দু জলের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার যন্ত্রণা দেখিয়া ও কাতরোক্তি শুনিয়া অনেকের মনে দয়ার উদ্রেক হইল বটে; কিন্তু তাঁহার নিকটে গিয়া এক বিন্দু জল দিতে কাহারও সাহস হইল না।—আপন জীবনের প্রতি মমতা থাকিলে, কি পরের জীবন-রক্ষা করা যায়?

যে রাস্তায় পড়িয়া মরণাপন্ন ভদ্রলোকটী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, সেই রাস্তা দিয়া কয়েকটী স্ত্রীলোক কলসী কক্ষে জল আনিতে যাইতেছিলেন। হৈমবতীও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। হৈমবতী নিতান্ত চিন্তাকুল-ভাবে চলিতেছিলেন। হরিদাসকে গুরুমহাশয় বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। তাহার বিদ্যা-শিক্ষার কি হইবে? বাছা চিরকাল মূর্খ হইয়া থাকিবে, চিরজীবন কষ্ট পাইবে।'' এই সমস্ত ভাবনায় হৈমবতীর অন্য দিকে মনোযোগ ছিল না। এমন সময়ে সঙ্গের এক জন স্ত্রীলোক বলিলেন, "দিদি! ওপথে যাওয়া হ'বে না। ঐ দেখ, একটী লোক ওলাউঠা রোগে মারা যাচ্ছে। চল আমরা অন্য পথে যাই।''

হৈমবতীর ভাবনায় বাধা পড়িল। দেখিলেন, অদূরে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া একটী যুবক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, এবং অতি ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিতেছে, "এক বিন্দু জল দাও গো! আমায় বাঁচাও গো!"

করুণাময়ীর করুণা-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া কলসী করিয়া জল আনিয়া পীড়িতের মুখে দিলেন। সঙ্গিনীরা

নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "সাধ করে মরণের ইচ্ছা! ওলাউঠা রোগীকে কি কখনও ছুঁইতে হয়!" হৈমবতী বলিলেন, "মানুষ যদি এমন অবস্থায় মানুষকে পরিত্যাগ করে, তবে তাহার মনুষ্যত্ব কি?—আহা! বেচারার কি কষ্টই না হচ্ছে!"

পীড়িত ভদ্রলোকটী জীবনে কখনও এমন মধুর স্নেহময় বাক্য শ্রবণ করেন নাই। হৈমবতীর কথা শুনিয়া তাঁহার অসহ্য পীড়ার যন্ত্রণা যেন অর্দ্ধেক উপশমিত হইল, মনের আবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা! কে তুমি? আমায় আর একটু জল দাও।"

আবার হৈমবতী রোগীর মুখে জল দিলেন। অসহ্য পিপাসার যন্ত্রণা দুর হইলে, ভদ্রলোকটী একটু সুস্থ হইলেন। হৈমবতী স্বীয় অঞ্চল দ্বারা ব্যজন করিতে করিতে বাৎসল্য-মধুর-কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন; আমি স্ত্রীলোক, কি করিয়া আপনাকে বাড়ী লইয়া যাইব?"

ভদ্রলোকটী অপেক্ষাকৃত সবল-কণ্ঠে বলিলেন, "মা! এখনও আমি কিছু দুর হাঁটিয়া যাইতে পারি। কিন্তু আমি আর কোথাও যাইব না। আমি যে রোগে আক্রান্ত হইয়াছি, তাহাতে আমার উদ্ধার নাই। আমি মরিব, যাঁহার আশ্রয়ে যাইব, আমার সংস্রবে তাঁহার অমঙ্গল হইতে পারে।—মা! আপনি কে জানি না; যিনি হউন্, আপনি সাক্ষাৎ দেবী! আপন প্রাণ তুচ্ছ ভাবিয়া পরকে এরূপ যত্ন করিতে আমি অল্প লোককেই দেখিয়াছি। আমি আপনার গৃহে যাইব না, আমার জন্ম আপনার পুত্রকন্যার অমঙ্গল হইতে পারে।

আপনিও আর অধিক-ক্ষণ আমার কাছে থাকিবেন না; একটী পাত্রে আমার জন্য কিছু জল রাখিয়া গৃহে যান্।”

পীড়িতের নিরাশা-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৈমবতীর চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল; অতি করুণ-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, “আপনার অমঙ্গল-ভয়ে নিরাশ্রয় পীড়িত ব্যক্তিকে জীবন্ত মৃত্যু-মুখে ফেলিয়া যাইব? বিধাতা যেন কখনও আমার এমন প্রবৃত্তি না দেন! আমার নিজের সন্তানের যদি এমন পীড়া হইত, আমি কি তাহাকে ত্যাগ করিতাম? যাহাকে যত্ন করিবার কেহ নাই, তাহাকে যদি যত্ন না করিলাম, তবে স্নেহ-মমতা লইয়া কি করিব? মহাশয়! যদি জগদীশ্বরের ইচ্ছা না থাকে, আমার কোনও অমঙ্গল হইবে না, আর তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে, অমঙ্গল আপনিই হইবে। আমি কখন আপনাকে এরূপ নিরাশ্রয় ভাবে পথে ফেলিয়া যাইতে পারিব না। আপনি আমার কাঁধে ভর করিয়া ধীরে ধীরে চলুন। যদিও আমি এক জন অপরিচিত স্ত্রীলোক, কিন্তু লজ্জা সম্ভ্রমের সময় এখন নয়।”

তথাপি ভদ্রলোকটী যাইতে স্বীকৃত হইলেন না, বলিলেন, “আপনি স্ত্রীলোক, আপনি আমাকে লইয়া গেলে, আপনার বাড়ীর কর্ত্তা যে আমায় স্থান দিবেন, তাহার বিশ্বাস কি?”

হৈম। সে জন্য আপনার চিন্তা নাই। আমি যাঁহার দাসী, তিনি পরের জীবন-রক্ষার জন্য আপনার জীবন দান করিতে কখনও কুণ্ঠিত নন্।

অনন্তর হৈমবতী পীড়িতের হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। নিতান্ত দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত পীড়িত পথিক হৈমবতীর

কাঁধে ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে রোগী তাঁহার গায়ের উপরই বমি করিয়া দিলেন। অকুণ্ঠিত-চিত্তে হৈমবতী হস্তদ্বারা তাহা পরিষ্কৃত করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে হৈমবতী এই পীড়িত আগন্তুককে গৃহে লইয়া পরিষ্কৃত শয্যায় শোয়াইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ভৃত্য রামধনকে চিকিৎসক ডাকিতে পাঠাইলেন। চিকিৎসক আসিতে যতক্ষণ বিলম্ব হইল, ততক্ষণ হৈমবতী নিজে যে কিছু মুষ্টিযোগ জানিতেন, তাহাই প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। চিকিৎসক আসিয়া রোগীকে স্পর্শ করিতে চাহিলেন না; কারণ তাহাতে তাঁহার বিশেষ কোনও লাভের আশা নাই। হৈমবতী দরিদ্র রমণী, তাঁহাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে পারিবে না, অনর্থক এমন ভয়ানক রোগের রোগীকে চিকিৎসক স্পর্শ করিবেন কেন? কিন্তু পীড়িত ব্যক্তি বিশেষ ধনীলোক। তাঁহার কাছে যথেষ্ট অর্থ ছিল; তিনি তাহা সমস্তই হৈমবতীর কাছে দিয়াছেন। হৈমবতী তাহা হইতে চিকিৎসকের উপযুক্ত দর্শনী তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন, তখন চিকিৎসক সাদরে রোগীর চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করিলেন। ঔষধের দাম লইয়া নানা রকম ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রোগ কিছুমাত্র উপশমিত হইল না; বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিন গত হইল, রাত্রি আসিল, রোগীর অবস্থা ক্রমাগত মন্দ হইতে লাগিল।

গভীরা রজনী। হৈমবতী একাকিনী মুমূর্ষু অতিথির শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া, নীরবে অশ্রু-বর্ষণ করিতেছেন। যেন মরণাপন্ন পুত্রের পার্শ্বে স্নেহময়ী জননী শঙ্কাকুলিতা!—

যেন মূর্ত্তিমতী করুণাদেবী!—কৃতান্ত প্রতিমুহূর্ত্তে তিল তিল করিয়া রোগীর সমীপবর্ত্তী হইতেছে; যেন সাধ্বী হৈমবতীর ভয়ে ভীত হইয়াই কৃতান্ত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। হৈমবতী দণ্ডে দণ্ডে রোগীকে ঔষধ সেবন করাইতেছেন, আর ভাবিতেছেন "আহা! এই যুবকের জননী কি ভাগ্যহীনা! অভাগিনী যখন শুনিবে তাহার অঞ্চলের নিধি,—বুক-জুড়ান-ধন বন্ধু-বান্ধব-হীন বিদেশে শমনের গ্রাসে পতিত হইয়াছে; তখন তাহার অন্তর কি করিবে? যখন ভাবিবে, তাহার এত আদরের ধন,—সোণার চাঁদ বিনা-যত্নে, বিনা-চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে; তখন কি সে প্রাণ-ধারণ করিতে পারিবে? আর যুবকের মনেই বা এখন কি লইতেছে! ইহার মাতা আছে, ভাই আছে, বন্ধু আছে, ধনৈশ্বর্য্য আছে; এ সব থাকিতে এ নির্ব্বান্ধব প্রবাসে যুবক কি কষ্টেই না প্রাণত্যাগ করিবে!—জগদীশ্বর! আমার জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর আমার যাহা কিছু আছে,—যথাসর্ব্বস্ব লইয়াও কি যুবকের প্রাণ-রক্ষা করিতে পার না?"

যথার্থই যেন জগদীশ্বর হৈমবতীর প্রার্থনা শুনিলেন। সহসা রোগীর চৈতন্য-সঞ্চার হইল, চক্ষু মেলিয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিলেন, "মা! জল।"

আশ্বস্ত হইয়া হৈমবতী যুবকের মুখে জল দিলেন, এবং আর এক বার ঔষধ সেবন করাইলেন। তাহার পর রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতে লাগিল। প্রভাতে চিকিৎসক আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, "রোগীর জীবনের কোনও বিঘ্ন নাই।"

নিজের পরমায়ু-বলে হউক, অথবা সাধ্বী হৈমবতীর পুণ্য-বলে হউক, যুবক এই ভীষণ রোগ হইতে,—সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল হইতে এ যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলেন। হৈমবতীর আনন্দের সীমা রহিল না। যিনি প্রাণের টানে পরকে বাঁচাইতে গিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এ আনন্দ তিনিই বুঝিবেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সাধুর অভাব ঈশ্বরই পূরণ করেন।

হৈমবতীর কৃপায় যে যুবকের জীবন-রক্ষা হইল, তাঁহার নাম গিরিজানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি কলিকাতার এক ধনবানের পুত্র ও বিশেষ সদাশয় লোক। সাধ্বী ব্রাহ্মণ-পত্নীর এইরূপ অযাচিত করুণালাভ করিয়া তিনি আসন্ন-মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলেন। আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে তিনি হৈমবতীর চরণে আত্ম-বিক্রীত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "ইনি সাক্ষাৎ দেবী। মনুষ্য-হৃদয়ে এত দয়া সম্ভবে না। ইঁহারই পুণ্য-বলে আমার জীবন রক্ষা হইল, নইলে এই ভীষণ রোগ হইতে কেহ কখনও নিষ্কৃতি পায় না। কিন্তু কিরূপে আমি ইঁহার এই অপরিশোধনীয় ঋণের বিন্দুমাত্রও পরিশোধ করিতে পারি? ইনি নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় অত্যন্ত কষ্টে আছেন; স্বামী অন্ধ, পুত্র কন্যা দুইটীই অপগণ্ড, জগদীশ্বর এমন সুশীলাকে এমন অবস্থায় রাখিয়াছেন, এ তাঁহার কি সুবিচার!"

ক্রমে গিরিজাবাবু জানিতে পারিলেন, পুত্রের শিক্ষা-বিধানের জন্য হৈমবতী বড় চিন্তিত। গিরিজাবাবু মনে মনে ভাবিলেন, এই সুযোগে হয়ত আমি আমার জীবনদায়িনীর কিছু উপকার করিতে পারিব। তিনি হৈমবতীকে বলিলেন,

"মা! আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আমি হরিদাসকে আমার সঙ্গে লইয়া যাই। বাড়ীতে থাকিলে উহার লেখাপড়া হইবার সুবিধা হইবে না।"

পুত্রের শিক্ষার উপায়ই হৈমবতীর বর্ত্তমান সময়ের প্রধান চিন্তা। তাহার এমন সুন্দর সুযোগ উপস্থিত হইল, কিন্তু হৈমবতী ভাবিলেন, আমি এই অপরিচিত ভদ্রলোকটীকে পীড়িত অবস্থায় আশ্রয় দিয়াছি; ইহা ত মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্মই। ভদ্রলোকটী ইহারই জন্য হরিদাসের শিক্ষার গুরুভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সামান্য উপকার করিয়া, তাহার এইরূপ গুরুতর প্রতিদান লওয়া কি কর্ত্তব্য? দুরবস্থায় পড়িলে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করায় দোষ নাই, কিন্তু উপকৃত জনের নিকটে প্রতিদান গ্রহণ কর্ত্তব্য নয়।" এই সমস্ত ভাবিয়া হৈমবতী কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া গিরিজাবাবু বলিলেন, "আপনি ইহাতে দ্বিরুক্তি করিবেন না। আমাকে নিজের পুত্র বলিয়া জানিবেন। আপনার হরিদাস যেমন, আমিও তেমন। আমার অন্য সহোদর ভ্রাতা নাই, হরিদাসকে দিয়া আমি ভ্রাতৃস্নেহের সাধ মিটাইতে পারিব। ঈশ্বর কৃপায় আমার বিশেষ কোনও অভাব নাই। হরিদাসকে আমার কাছে পাঠাইতে আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না। আপনি যখন বলিবেন, তখনই আমি ওকে আনিয়া আপনাকে দেখাইয়া লইয়া যাইব।"

সুখে দুঃখে হৈমবতীর চক্ষে জল আসিল। সুখ,—তাঁহার হরিদাসের শিক্ষার সদুপায় হইল, দুঃখ,—তাঁহার এত আদরের পুত্র পরের গলগ্রহ হইতে চলিল। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া

হৈমবতী বলিলেন, "বাবা! ঈশ্বর আমার অদৃষ্টে যে দুঃখ লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডাইতে মনুষ্যের সাধ্য নাই; এত যন্ত্রণা কেবল ঐ বালক-বালিকা দুইটীর মুখ চাহিয়াই সহ্য করিতেছি। আমার হরিদাসের প্রতি যিনি দয়ার চক্ষে চাহিবেন, আমি চিরজীবন তাঁহার ক্রীত-দাসী হইয়া থাকিব। জগতে আমি আর কোনও সুখের কামনা করি না, জগদীশ্বরের কাছে আমার কেবলমাত্র এই ভিক্ষা; যাহাতে আমার এই অবোধ বালক মানুষ হইতে পারে। আমি ভাল করিয়া ওদের ক্ষুধায় দু'টী অন্ন দিতে পারি না; অন্নবস্ত্রের কষ্টে আমার বাছাদের দুঃখের সীমা নাই। পরিণামে যে সুখী হইবে, আমি এমন কিছুও করিয়া যাইতে পারিলাম না। আপনার কৃপায় যদি আমার অনাথ বালক মানুষ হইতে পারে, তবে এর চেয়ে উপকার আর আমার কি আছে?"

গিরিজা। ভ্রাতা ভ্রাতাকে ভালবাসিবে, ভ্রাতাকে শিক্ষিত করিবে, এ আর উপকার কি মা? নিতান্ত সৌভাগ্য-ক্রমে আমি এই বিদেশে আসিয়া পীড়িত হইয়াছিলাম; তা'ই আপনার ন্যায় মা পাইলাম, হরিদাসের ন্যায় ভাই পাইলাম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমি যেন চিরজীবন আপনার পদসেবা করিতে পারি।

পর দিবস হৈমবতী স্বামীর অনুমতি লইয়া, হরিদাসকে গিরিজাবাবুর হস্তে সঁপিয়া দিলেন। নীরবে অশ্রুমোচন করিতে করিতে স্নেহময়ী জননী প্রাণাধিক শিশু-পুত্রকে দূর দেশে বিদায় করিলেন! সংসারের সহস্র দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও যাহাদের মুখপানে চাহিয়া হৈমবতী সমস্ত যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতেন,

যাহাদের হাসি-খেলা, আমোদ-প্রমোদ দেখিয়া সমস্ত যন্ত্রণায়ও হৈমবতীর প্রাণ উল্লাসিত হইত, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর তিনি যাহাদিগকে বক্ষে লইয়া, যাহাদের চাঁদমুখ চুম্বন করিয়া আনন্দে শ্রান্তিদূর করিতেন, আজ তাহাদের এক জন নয়নের অন্তরাল হইল! হরিদাস একাদশবর্ষীয় শিশু, কখনও গৃহের বাহির হয় নাই; মাতার হস্তে না খাইলে যাহার আহার হয় না, মাতার ক্রোড় না হইলে যাহার নিদ্রা হয় না, যাহার সুখের কথা মায়ের কাছে, দুঃখের কথা মায়ের কাছে, সেই মাতৃ-গত-প্রাণ অপগণ্ড-শিশু দূর দেশে অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের কাছে কিরূপে থাকিবে? সকলকে ছাড়িয়া হতাশে বাছার পীড়া হইতে পারে? পীড়া হইলে কে তাহাকে মায়ের মত যত্ন করিবে? কলিকাতা অতি ভয়ানক স্থান! সেস্থানে নাকি কত পাষণ্ড বালক ভুলাইয়া চুরি করিয়া লইয়া যায়। বাছার দিকে কে চাহিবে? গিরিজাবাবু বড় সদাশয় লোক; কিন্তু পুরুষ মানুষ, বালক-বালিকা পালন করিতে জানেন না। তাঁহার বাড়ীর অন্যান্য লোকে যদি আবার হরিদাসকে অযত্ন করে। হৈমবতী মনে মনে এইরূপ কত চিন্তা করিতে লাগিলেন; পরে সজল-নয়নে ঊর্দ্ধ করে বলিলেন, "মা মঙ্গলচণ্ডি! কালীঘাটেশ্বরী! দয়াময়ী মা! দুঃখিনীর জীবন-সর্ব্বস্ব হৃদয়-রত্নটী তোমারই পদে সঁপিয়া দিলাম। কাঙ্গাল ব'লে দৃষ্টি করিও মা!"

জননীর স্নেহ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল; চক্ষে অবিরল ধারা বহিতে লাগিল। তখন প্রতিবাসিনী এক রমণী আসিয়া বলিল, "এখন কাঁদলে কি হয় মা! আমরা তখনই ব'লে-

ছিলাম, এমন দুধের ছেলেকে পরের কাছে পাঠিও না। জানি না, তোমার কেমন প্রাণ! কোথাকার কে, কুল জানি না, শীল জানি না, সাত সমুদ্র তের নদী পারে তা'র ঘর, তা'রই কাছে বুকের ধন স'পে দিলে! আহা! বাছা নিতান্ত ছেলেমানুষ! না হয় মূর্খ হ'য়ে থা'কৃত, তবু ত কোলের ধন কোল জু'ড়ে রইত।"

চক্ষু মুছিয়া হৈমবতী বলিলেন, "তা কি করি মা! আমি স্নেহের বাধ্য হ'য়ে তা'কে ঘরে রাখ্লে, তা'র পরিণামে কি হ'বে? বাছাকে চ'খের আড়াল ক'রে, আমার বুকের মধ্যে যা কচ্ছে, তা কা'কে বুঝাব? আমি নিতান্ত হতভাগিনী! নইলে হরিদাসের লেখাপড়ার জন্ত আমায় কাঁদতে হবে কেন! ও যাঁর ধন, তাঁর কাছে থে'কে ত লেখাপড়া শিখ্তে পারত। তিনি যেখানে চাকরী কর্তেন, সেখানে ভাল স্কুল ছিল। বিধাতা আমার সে সকল সাধেই বাদ সেধেছেন! আমার বাছা যদি মানুষ হ'তে পারে, তবে এ দুঃখ আমার থাক্‌বে না। স্নেহের বশে যে মা-বাপ সন্তানকে মূর্খ করে, সে মা-বাপ সন্তানের পরম শত্রু! মা কালীর হাতে বাছাকে স'পে দিয়েছি, তাঁর যা ইচ্ছা থাকে তাই হ'বে।"

কলিকাতায় নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়া হরিদাস ও গিরিজাবাবু পত্র লিখিলেন। হৈমবতী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কন্যাকে অপাত্রে না দিয়া যমকে দেওয়া ভাল।

হৈমবতীর চিন্তার বিষয় অনেক ঘুচিল। হরিদাস কলিকাতায় গিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে লেখাপড়া করিতেছে। সপ্তাহে সপ্তাহে মায়ের কাছে পত্র লিখিতেছে। প্রতি পত্রে লিখিয়া জানাইতেছে, "গিরিজাবাবু তাহাকে সহোদরাধিক ভালবাসেন, গিরিজাবাবুর মাতার কাছে সে সর্ব্বদাই মাতৃস্নেহ পাইয়া থাকে। গিরিজাবাবুর কমলা নামে একটী দুই বৎসরের ভগিনী আছে, সে তাহার বড় অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। হরিদাসেরও বালিকার প্রতি বড় মায়া জন্মিয়াছে।" সুতরাং হৈমবতী হরিদাসের জন্য আর বড় চিন্তা করেন না। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান চিন্তা, স্বামীর অন্ধতা; সে বিষয়ে তিনি অনেক চিন্তা করিয়াছেন, অনেক অশ্রু-বর্ষণ করিয়াছেন। সময়ে সকল দুঃখেরই লাঘব হয়, হৈমবতীর এ চিন্তারও কিছু লাঘব হইয়াছে।

হৈমবতীর সংসারে আজ কাল বড় কষ্ট নাই। পরিবার পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। হরিদাস বাড়ীতে নাই, সারদা-ঠাকুরাণীর মৃত্যু হইয়াছে। রামধন পীড়িত হইয়া বাড়ীতে আছে। পরিবারের মধ্যে এখন কেবল স্বামী ও স্ত্রী, আর বালিকা কন্যা বিরজা মাত্র। কৃতজ্ঞ কৃষকগণ এখনও ধান চা'ল দিয়া

হৈমবতীর যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। ছুঁচ্-সূতার কাজ করিয়া হৈমবতী মাসে মাসে দুই এক টাকা উপায় করেন, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে দিন এক রকম স্বচ্ছন্দে চলিতেছে।

গিরিজাবাবু কয়েক বার হৈমবতীর সাহায্যার্থে টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। হৈমবতী তাহাতে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "আপনার প্রদত্ত অর্থ-সাহায্য পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলাম; কিন্তু আমাকে আর এইরূপ টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। আজ কাল আমার বিশেষ কোনও অভাব নাই। প্রয়োজন হইলে, মাতা যেমন পুত্রের কাছে চাহিয়া লইতে পারে, আমিও তেমনি চাহিয়া লইব। ভবিষ্যতে যদি আপনি এইরূপ টাকা পাঠা'ন তবে আমি বড় অসন্তুষ্ট হইব।"

এইরূপে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। হরিদাসের বিদ্যাশিক্ষার ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল। পুত্রের উন্নতি-লাভ দর্শনে মাতার অন্তরের দুঃখ কতকাংশ দূরীভূত হইল; কিন্তু বাড়ী ঘরের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতে লাগিল। সাত আট বৎসরের অসংস্কারে চালা-ঘরগুলি সমস্তই পড়িয়া গিয়াছে। ইষ্টকালয়টীরও স্থানে স্থানে চূণ-কাম উঠিয়া গিয়াছে, কোথাও বা দুই এক খানা ইট খসিয়া পড়িয়াছে, কোথাও জানালা দরজা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আর পাঁচ সাত বৎসর পরে, রেবতীবাবুর মাথা রাখিবারও স্থান থাকিবে না। রেবতীবাবু এ সমস্ত দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন না, হৈমবতীও সংসারের দুরবস্থার বিষয় তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহার মনঃপীড়া বৃদ্ধি করিতেন না। কিন্তু রেবতীবাবু সব বুঝিতেন, এবং মনোদুঃখে সর্ব্বদাই

মৃত্যু-কামনা করিতেন। বাস্তবিক, মৃত্যুও যেন তাঁহাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিতে আসিতেছে! তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার উপর আর একটী চিন্তা, বিরজা ক্রমশঃ বয়স্থা হইয়া উঠিল; তাহাকে পাত্রস্থা করা প্রয়োজন। রেবতীবাবু কুলীন ব্রাহ্মণ। সমাজ-প্রথা অনুসারে আজ কাল কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ দেওয়া বড় সহজ নয়; বিশেষ অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন। দরিদ্রের দুহিতা বিরজাকে কে গ্রহণ করিবে?—হায়! সর্ব্বনাশী 'বিবাহ-পণ!' তুমি আর কত কাল হিন্দু-সমাজের হৃদয়-রক্ত শোষণ করিবে?—বিরজা হৈমবতীর বড় আদরের কন্যা, নিতান্ত অপাত্রে দান করিতে তিনি কিছুতেই স্বীকৃত নন্। ঘর ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহা তিনি দেখিতে চান্ না; তাঁহার এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাঁহার বংশ-মর্য্যাদা দেখিবার সময় নাই। কুল ভঙ্গ হয় তাহাও স্বীকার; কিন্তু তিনি কোনও গণ্ড-মূর্খ পাত্রে কন্যা সমর্পণ করিতে স্বীকৃত নন্। তিনি অনেক সময়ে ভাবিয়াছেন, গিরিজাবাবুর দ্বারা কোনও একটী সৎপাত্র সংগ্রহ করিবেন; কিন্তু এখনও তাঁহার কাছে সে কথা প্রকাশ করেন নাই।

রাজাপুরের নিকটে 'রায়ের গাঁ' নামক একটী গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় নামক এক জন ধনী ব্রাহ্মণ বাস করেন। বিরজাকে অত্যন্ত রূপবতী ও বয়স্থা দেখিয়া তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, এবং রেবতী-বাবুর কাছে লোক পাঠাইলেন। ঘটক রেবতীবাবুর কাছে আসিয়া বলিল, "দীনবন্ধু তাঁহাকে নগদ হাজার টাকা দিতে

স্বীকৃত আছেন, এবং কন্যাকে দুই হাজার টাকার স্বর্ণালঙ্কার দিবেন; এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের যাবজ্জীবন ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিবেন।” রেবতীবাবু হৈমবতীকে ডাকিয়া সমস্ত বলিলেন। হৈমবতী শুনিয়া একটু চিন্তা করিলেন। তিনি দীনবন্ধু মুখুর্য্যেকে জানিতেন, তাঁহার টাকা-কড়ি, বিষয়-সম্পদ যথেষ্টই আছে; কিন্তু মূর্খের হস্তে অর্থ পড়িলে, যাহা ঘটিয়া থাকে, তাঁহারও তাহাই ঘটিয়াছে। তাঁহার দুশ্চরিত্রের কথা গ্রামময় রাষ্ট্র রহিয়াছে। তাঁহার আরও দুইটী পত্নী আছে, কেবলমাত্র বিরজার রূপ দেখিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে রমণীর কেবল ভোগ-বিলাসের সম্বন্ধ মাত্র। হইতে পারে, বিরজার রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে ভালবাসিবেন; কিন্তু সপত্নী-নির্যাতনে বিরজা কখনও সুখিনী হইতে পারিবে না। যদিও স্বামীর সোহাগে বিরজার বিশেষ কোনও কষ্ট না হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে তাহার সপত্নীদিগকে সর্ব্ব-সুখে বঞ্চিত করিতে হইবে; সপত্নী-বিদ্বেষে বিরজা ক্রমে আত্ম-পরায়ণা হইয়া উঠিবে, তাহার স্ত্রী-জীবনের কোমলতা, তৎসঙ্গে দয়া-মমতা সমস্ত সদ্‌গুণাবলী নষ্ট হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি দুইটি পত্নী থাকিতেও রূপে মুগ্ধ হইয়া দারান্তর গ্রহণ করিতে পারে, সে যে অন্য কোনও রূপসীর রূপে মুগ্ধ হইবে না, তাহার বিশ্বাস কি? সত্য বটে, কন্যার বিবাহ দিয়া দরিদ্রা হৈমবতী সহস্র মুদ্রা লাভ করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ-মোচন করিতে পারেন, কন্যাও ধনবানের গৃহিণী হইয়া সুখে দিন যাপন করিতে পারে; কিন্তু বুদ্ধিমতী জননী ভাবিলেন, “অনাহারে প্রাণত্যাগ

করিব, তথাপি বিরজাকে সপত্নীর ঘরে, এমন মূর্খ স্বামীর করে দিতে পারিব না। বরং কোনও ভিখারীকে কন্যাদান করিব, তথাপি এ পাত্রে কন্যা সমর্পণ করিতে পারিব না।"

এই সমস্ত ভাবিয়া, স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া হৈমবতী ঘটককে বলিলেন, "আমরা নিতান্ত দরিদ্র, মুখুর্য্যে মহাশয়ের ন্যায় রাজা ব্যক্তির সঙ্গে আমরা কিরূপে সম্বন্ধ করিতে পারি? আমার বিরজা যেমন কাঙ্গালের ধন, তেমনি কাঙ্গালের ঘরেই যাইবে।"

ইহা হইতেই পরিণামে বিষময় ফল ফলিল। দীনবন্ধু মুখুর্য্যের ন্যায় পাষণ্ড লোক জগতে দুর্ল্লভ। সে ভাবিয়াছিল, দরিদ্র রেবতীবাবু তাঁহাকে কন্যা সমর্পণ করিতে পারিলে বিশেষ সৌভাগ্য জ্ঞান করিবেন। কিন্তু তিনি সম্বন্ধ অস্বীকার করাতে, পাপিষ্ঠ আপনাকে গুরুতর অপমানিত বোধ করিল। দুষ্ট অনুচরদিগকে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, যেরূপেই হউক্, রেবতী চাটুর্য্যের কন্যাকে বিবাহ করিতেই হইবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শত্রুকেও বঞ্চিত করিতে নাই।

ভৃত্য রামধন বৃদ্ধ ও পীড়িত হইয়াছে। এখন আর সে কাজকর্ম্ম করিতে পারে না। তাহার পুত্রেরাও কর্ম্ম-ক্ষম হইয়াছে; বৃদ্ধ পিতাকে তাহারা এখন আর কাজকর্ম্ম করিতে দিতে চাহে না। রামধন চাকরী ছাড়িয়া এখন বাড়ীতেই আছে। কিন্তু যাঁহার লুণ খাইয়া সে পনর বৎসরকাল বাঁচিয়াছে, তাঁহার গুণের কথা সে বিস্মৃত হয় নাই। এখনও বৃদ্ধ রামধন প্রত্যহ অন্ততঃ একবার হৈমবতীর তত্ত্ব লইয়া যায়। এখনও তাহার আদেশে তাহার পুত্রেরা হৈমবতীর প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্ম করিয়া দেয়। বিশেষতঃ বিরজা রামধনের বড় অনুগত; রামধনও বিরজাকে কন্যার অপেক্ষা ভালবাসে। মাঝে মাঝে সে বিরজাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া মুড়ি, মুড়্কি, আম, পেয়ারা প্রভৃতি খাইতে দেয়। বয়স্থা কন্যাকে গৃহের বাহির করা সঙ্গত নয় জানিয়াও, হৈমবতী রামধনের বাড়ীতে বিরজাকে আসিতে দিতে কোনও দ্বিধা করিতেন না। রামধনকে তিনি সন্তান অপেক্ষাও বিশ্বাস করিতেন।

দীনবন্ধু মুখুর্য্যে বিরজাকে বিবাহ করিতে অনেক চেষ্টা পাইল। রেবতীবাবুকে অনেক প্রলোভন দেখাইল; কিন্তু

কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে পাপিষ্ঠ কৌশলে বিরজাকে অপহরণ করিবে স্থির করিল। সে জানিতে পারিল, রামধনের বাড়ীতে বিরজা অনেক সময়ে আসিয়া যাইয়া থাকে। ভাবিল, "রামধন ছোট লোক, অবশ্য অর্থের প্রলোভনে ভুলিবে; তাহারই দ্বারা অনায়াসে কার্য্য-সিদ্ধি হইতে পারে।" ইহা ভাবিয়া সে এক দিন রামধনকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিল, এবং কার্য্য-সিদ্ধি হইলে তাহাকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করিল। পাপিষ্ঠের কথা শুনিয়া রামধন একটু ভাবিল; ভাবিয়া বলিল, "হাঁ, পারিব।"

অতঃপর স্থির হইল, রামধন বিরজাকে আনিয়া তাহার বাড়ীতে রাখিবে; দীনবন্ধু রাত্রিতে গিয়া তাহাকে লইয়া আসিবে। দিন স্থির করিয়া রামধন বাড়ীতে আসিল। বাড়ীতে আসিয়া পুত্রগণের সহ পরামর্শ করিয়া বিরজাকে আনিতে চলিল।

অপরাহ্ন সময়ে রামধন বিরজাকে লইয়া আসিল। তাহাকে পূর্ব্ববৎ কিছু মুড়ি মুড়্কি খাইতে দিল। বেলা যায় দেখিয়া বিরজা বলিল, "দাদা! আমায় বাড়ীতে দিয়ে এস।" রামধন বলিল, "দিদি! আজ রাত্রিতে এখানে থাক্‌তে হ'বে।" বিরজা বলিল, "তা কি হয়! মা বড় ব্যস্ত হ'বেন।" রামধন কোনও কথা বলিল না, বিরজাকে বাড়ীতেও দিয়া আসিল না। বিরজা একটু চিন্তিত হইল।

দুই চারি দণ্ড রাত্রির পর দীনবন্ধু তাঁহার এক জন অনুচর, দুই জনমাত্র বাহক ও একখানি শিবিকা লইয়া

রামধনের বাড়ীতে আসিল। অধিক লোক লইয়া আসিতে রামধন বারণ করিয়াছিল। পরম যত্নে রামধন তাহাদের অভ্যর্থনা করিল। দীনবন্ধু আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন রামধন! সংবাদ মঙ্গল ত?" রামধন বলিল, "মঙ্গল! টাকা গুণিয়া দিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়।"

দীনবন্ধু হাসিতে হাসিতে টাকার তোড়া বাহির করিয়া বলিল, "এই দেখ টাকা, টাকার চিন্তা কি? কিন্তু তুমি কতদূর কি করিয়াছ, চক্ষে না দেখিতে পাইলে, আমার বিশ্বাস হইতেছে না।"

রামধন দীনবন্ধুকে গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া বিরজাকে দেখাইল। পাপিষ্ঠ দীনবন্ধুমুখুর্য্যেকে দেখিয়া ও তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া ভয়ে বিরজা কাঁদিয়া উঠিল। রামধন বিরজার কাণের কাছে চুপে চুপে কি বলিয়া তাহাকে শান্ত করিল। বিরজা রোদন সম্বরণ করিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পাপিষ্ঠ দীনবন্ধু পরমানন্দে হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "রামধন! তুমি আমার বড় কাজ করিলে। তোমা হইতেই আমার মান বজায় রইল। এতদিনে আমার মনঃকষ্ট দূর হইল।"

রামধন আর ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিল না; সবলে দীনবন্ধুর হস্ত হইতে টাকার তোড়াটী ছিনাইয়া লইয়া, সগর্ব্বে গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিল, "পাষণ্ড! এতদিন যত পাপ করিয়াছ, যত অনাথ অনাথার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। মূর্খ! বানর হইয়া রত্নহার গলে পরিতে সাধ? সাক্ষাৎ দেবীর গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, ভাবিয়াছিস্, তোর্ মত পাষণ্ড, তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে! পনর বৎসর কাল সপরিবারে

যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি, ভাবিয়াছিস্, আজ আমি তাঁহারই সর্ব্বনাশ করিব।”

ইত্যবসরে রামধনের পুত্রগণ লাঠি সোটা লইয়া দীনবন্ধু ও তাহার অনুচরদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা অন্য গৃহে লুকাইয়া ছিল। সকলে নির্দ্দয় প্রহারে পাপিষ্ঠকে অনুচর সহ ভূমিতলে পাতিত করিল। রামধন অতি স্নেহে কম্পমানা বিরজাকে কোলে লইয়া বলিতে লাগিল, “দিদি! ভয় কি? এখনই তোমায় মায়ের কাছে দিয়া আসিব। রামধনের দেহে প্রাণ থাকিতেও কি তোমার কোনও অমঙ্গল হইতে পারে?”

বিহ্বলচিত্তে বিরজা রামধনের কোলে বসিয়া রহিল। ঘটনার কিছুমাত্রও বুঝিতে পারিল না। রামধন তখন পুত্রদিগকে বলিল, “আর প্রয়োজন নাই, যথেষ্ট হইয়াছে। যদি লজ্জা থাকে, তবে পাষণ্ডেরা আর কখনও এমন দুষ্কর্ম্ম করিতে যাইবে না।”

যেমন কর্ম্ম করিতে আসিয়াছিল, তেমনি প্রতিফল পাইয়া দুর্ম্মতি দীনবন্ধুমুখুর্য্যে দল বল সহ পলায়ন করিল। রামধন বিরজাকে কোলে লইয়া, টাকার তোড়াটী ও এক জন পুত্রের সঙ্গে বামণপাড়ার দিকে ছুটিল।

এদিকে হৈমবতী বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, রাত্রি দেড় প্রহর অতীত হইল, তবু রামধন বিরজাকে লইয়া আসিল না। তাঁহার ভাঙ্গা কপাল! মনে কতই আশঙ্কা হইতে লাগিল। কিন্তু রামধনের কাছে থাকিয়া বিরজার যে কোনও অমঙ্গল হইয়াছে, তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। হয়ত রামধন কোনও বিপদে পড়িয়া অবকাশ পাইতেছে না। মনে মনে

নানা রকম চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে বিরজাকে কোলে লইয়া রামধন আসিয়া উপস্থিত হইল। মায়ের কাছে গিয়া বিরজা হাঁফ ছাড়িল। রামধন টাকার তোড়াটী হৈমবতীর সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিল। হৈমবতী কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "সংবাদ কি?"

রামধন বলিল, "সংবাদ মঙ্গল, আমার বিরজা দিদি এই পাঁচ শত টাকা দর্শনী পাইয়াছে।" অতঃপর রামধন সমস্ত ঘটনার আদ্যন্ত বিবৃত করিয়া বলিল, "মা! পাষণ্ডের পাপের দণ্ডের স্বরূপ এই পাঁচ শত টাকা রাখিয়াছি। ইহার ব্যয়ে বিরজার বিবাহ হইতে পারিবে।"

হৈমবতী সমস্ত শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। মনে মনে নিরক্ষর রামধনের ধর্ম্ম-নিষ্ঠার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "রামধন! এ টাকাগুলি রাখা কর্ত্তব্য হয় নাই। পাপীই হউক, পুণ্যবানই হউক, কাহাকেও বঞ্চনা করিতে নাই। এ টাকাগুলি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।"

রাম। যে এমন পাপকর্ম্ম করিল, তাহার পাপের দণ্ড হইবে না! আমি যদি পাষণ্ডকে পুলিষে ধরাইয়া দিতাম, তাহা হইলে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর জেল খাটিতে হইত। পাঁচ শত টাকা ত সামান্য।

হৈম। সে কথা সত্য; কিন্তু সে পাপ করিয়াছে বলিয়া, আমরা কেন পাপ করিব?

রাম। আমরা কি পাপ করিতেছি? পাপীর দণ্ড দেওয়া কি পাপ?

হৈম। পরকে বঞ্চনা করা অবশ্য পাপ। এ এক রকম ডাকাতী করিয়া লওয়া হইয়াছে। আর পাপীর দণ্ড দিতে তোমার আমার ক্ষমতা কি? যিনি পাপ-পুণ্যের বিচারকর্ত্তা তিনিই দণ্ড দিবেন। এই টাকাগুলি অবশ্য দীনবন্ধুমুখুর্য্যেকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

রাম। আমরা চাষা, আপনার মত অত ধর্ম্ম বুঝিতে পারি না। আপনার যাহা অভিরুচি তাহাই করিবেন। আমি কিন্তু টাকা ফিরাইয়া দিতে তাহার কাছে যাইতে পারিব না। গেলে সে প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবে না।

সে দিবস রামধন আর বাড়ীতে গেল না, হৈমবতীর বাড়ী-তেই রহিল,—কি জানি জাত ক্রোধ হইয়া যদি পাষণ্ডেরা আবার রাত্রিতে আসিয়া কোনও রূপ অত্যাচার করে।

প্রভাতে হৈমবতী আর এক জন বিশ্বাসী লোক ডাকিয়া তাহার কাছে ঐ পাঁচ শত টাকা আর একখানি পত্র লিখিয়া দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে লিখি-লেন, "অবলা বলিয়া আমার শত অপরাধ মাপ করিবেন। চাষা রামধনের দোষ ভুলিয়া যাইবেন। উহাদের ভাল মন্দ জ্ঞান নাই। আপনার টাকা পাঁচ শত গুণিয়া লইবেন। আপনার ন্যায় লোকের এ অনাথার উপর অত্যাচার করা শোভা পায় না।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অধীর হইও না,—এ দিন রহিবে না।

সকলেই বলে রাত্রির পর দিন, দুঃখের পর সুখ। কিন্তু কই? সাধ্বী হৈমবতীর এ দুঃখ-যামিনী ত অবসান হইল না; বরং ক্রমশঃ গাঢ় হইতে লাগিল। দেশে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সমগ্র বঙ্গদেশে এবার পূর্ব্ব বৎসরের অর্দ্ধেক পরিমিত শস্যও জন্মে নাই। দেশ পাপে পূর্ণ, তাই দুর্ভিক্ষের এত প্রাবল্য!

নিঃসম্বলা হৈমবতীর দিন আর চলে না। রাজাপুরের কৃষকগণ এবার চারি আনা রকমের ফসলও পায় নাই, তাহাদের আপনাপন পরিবার প্রতিপালন করাই কষ্টকর হইয়াছে; হৈমবতীর সাহায্য করিবে কিরূপে? টাকায় পাঁচ ছয় সের মাত্র চাউল বিকাইতেছে। পৈতা বানাইয়া কাঁথা সেলাই করিয়া হৈমবতী যাহা কিছু উপায় করেন, তাহাতে আর কুলায় না। কত অর্থশালী লোক এবার পেটের অন্ন যুটাইতে পারিতেছে না। দরিদ্র অন্ধের গৃহিণী অবলা হৈমবতী আর কি করিবেন? কুলবধূ, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে পারেন না। সংবাদ আসিয়াছে, গিরিজাবাবু প্রায় তিন চারি মাস কঠিন রোগে শয্যাগত; এমন সময়ে তাঁহার কাছে নিজের দুরবস্থা জানান সঙ্গত বোধ করিলেন

না। হরিদাসকেও কোন কষ্টের কথা লিখিলেন না। স্বামী ও কন্যার ভরণ-পোষণ করিতে প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশ্রম করিয়া কি হইবে? একজন স্ত্রীলোকের আর সাধ্য কি?

অনশনে অর্দ্ধাশনে প্রায়ই হৈমবতীর দিন গত হইতেছে। কিন্তু এতদিন স্বামী ও কন্যাকে কখনও উপবাস করিতে হয় নাই। আজ তাহাও হইল। ঘরে মুষ্টিমেয় অন্নও নাই। পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে আজ একমুষ্টি ধারও মিলিল না। রামধনের ছেলেপিলে উপবাস করিয়া আছে; সেও কিছু সাহায্য করিতে পারিল না। কেবল মাত্র একটী পেপে ও একটী শসা আপন সন্তানের মুখ হইতে আনিয়া রামধন বিরজাকে দিয়া গিয়াছে। তাহাতেই বিরজার ক্ষুধার কতক নিবৃত্তি হইয়াছে।

সমস্ত দিন গত হইয়াছে; কিন্তু রাত্রি আর যায় না। দুঃখের রজনী বড় দীর্ঘ। বিরজা কতক্ষণ ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রজনী তৃতীয় প্রহর। দুর্ভাগ্য দম্পতির নিদ্রা নাই। রেবতীবাবু নীরবে প্রশান্ত-ভাবে উপবিষ্ট; পার্শ্বে হৈমবতী নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। গৃহে আলো নাই; ভগ্ন গবাক্ষ দিয়া যে চন্দ্ররশ্মি গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দ্বারা হৈমবতী স্বামীর অনশন-ক্লিষ্ট স্থির-মুখ-মণ্ডল অস্পষ্ট নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর কৃতান্তের কাছে করুণা ভিক্ষা চাহিতেছেন। জঠর-যন্ত্রণায় বালিকা দুহিতার মুখ-পদ্ম কীট-দষ্ট কলিকাবৎ বিবর্ণ ও শুষ্ক! অন্ধ অসমর্থ স্বামী অনশনে জীর্ণ শীর্ণ!——মৃত্যু! কেন এখনও অভাগিনীকে স্মরণ করিতেছ না!

অনেক ক্ষণ নীরব থাকিয়া, পরে রেবতীবাবু বলিলেন, "আর অধিক দিন আমাদিগকে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।"

রেবতীবাবুর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ও কম্পমান! হৈমবতী বলিলেন, "এ দুঃখ দূর করিতে মৃত্যু ভিন্ন আমাদের আর কে আছে?"

রেবতী। মৃত্যুই এখন আমাদের একমাত্র বন্ধু। আশা করি, অচিরাৎ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব।——কৃতান্ত! আর কেন? এখনও সদয় হও।

হৈম। আমাদের মরণই মঙ্গল, মরিয়া আমরা সুখী হইব; কিন্তু আমার বিরজার উপায় কি হইবে?

রেবতী। বিরজাও পিতামাতার সঙ্গ লইবে!

বলিতে বলিতে রেবতীবাবুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল: আহা! কি মর্ম্মান্তিক বাক্য! পিতার মুখে সন্তানের মরণ কামনা! কি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য!

মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া রেবতীবাবু পুনর্ব্বার বলিলেন, "হৈমবতি! তুমিই ভাগ্যবতী, পুণ্যবতী। সন্তানের প্রতিপালনে অসমর্থ স্বামীর পদসেবায় জীবন-পাত করিলে। এ অপেক্ষা স্ত্রী-জীবনে আর কর্ত্তব্য নাই। মরণকালেও তুমি স্বামী কন্যার মুখ দেখিতে দেখিতে সুখে দেহত্যাগ করিতে পারিবে। আমি যদি মরণকালে তোমার আর বিরজার মুখ দেখিয়া মরিতে পারিতাম, তাহা হইলে মরণেও আমার সুখ হইত।"

বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে হৈমবতী বলিলেন, "এ সময়ে দৃষ্টি-শক্তি থাকার চেয়ে অন্ধ হওয়াই ভাল! বিধাতা যদি এই মুহূর্ত্তে আমায় অন্ধ করিতেন, তাহা হইলে আমার যন্ত্রণার অনেক লাঘব

হইত; তোমার ঐ অনশন-ক্লিষ্ট বিষাদমাথা ম্লানমুখ, প্রাণাধিকা বিরজার এই শ্রী-হীন শীর্ণমূর্ত্তি আমার আর দেখিতে হইত না। যে অভাগিনী চক্ষের 'পরে স্বামী ও কন্যাকে অনাহারে মরিতে দেখিবে, তাহার ন্যায় হতভাগিনী আর কে আছে?——হা জগদীশ্বর! না জানি পূর্ব্বজন্মে কত মহাপাপ করিয়া আসিয়াছিলাম!"

রেবতী। থা'ক্, আর বিলাপের প্রয়োজন নাই। এস দুই জনে মিলে এখন সেই অন্তিমের সহায় অগতির গতি ভগবানকে ডাকি। আর সংসারের চিন্তা কেন? সংসারে যাহা হইবার তাহা হইল। এখন পরকালে যাহাতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, তাহার উপায় করি। যতক্ষণ জীবন আছে, এস, ততক্ষণ এক-মনে হরি-পাদ-পদ্ম ধ্যান করি।

হৈম। আমার সে শক্তি নাই। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ সংসারের মায়া ভুলিতে পারিব না। আমার হরিদাস দূর দেশে রহিল, মরিবার সময়ে তাহার চাঁদমুখ একবার দেখিতে পাইলাম না; অবোধ বালক যখন শুনিবে, তাহার জন্মের মত 'মা বলা' ফুরাইয়া গিয়াছে, তখন তাহার অন্তরের জ্বালা কে নিবাইবে? কি দেখিয়া, কাহার মুখ চাহিয়া বাছা শান্ত হইবে? আমার ননীর পুতুল বিরজা কোথায় যাইবে? আমার জীবন-সর্ব্বস্ব বক্ষের মণি দু'টী কাহার কাছে রাখিয়া যাইব? আমার বাছাদিগকে এই দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গে গেলেও আমার জ্বালা নির্ব্বাণ হইবে না।——হা জগদীশ্বর! অগতির গতি! পিতৃহীনের পিতা! মাতৃহীনের মাতা! নির্ব্বান্ধবের বান্ধব! আমার বাছাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিও,—কাঙ্গালের ধন বলিয়া

আমার বাছাদিগকে রক্ষা করিও,—অনাথ বলিয়া কৃপা করিও।

অনিবার্য্য মানসিক ক্লেশে অনশন-দুর্ব্বলা হৈমবতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। অন্ধ রেবতীবাবু অনুভবে বুঝিলেন, হৈমবতী মূর্চ্ছাগত; গায় হাত দিয়া দেখিলেন, হৈমবতীর সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মের স্রোত বহিতেছে, বক্ষঃস্থল কম্পিত হইতেছে, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আর্ত্তনাদ করিয়া রেবতীবাবু বলিলেন, "হৈম! হৈমবতি! পুণ্যবতি! অগ্রে চলিলে? তুমিই ভাগ্যবতী, স্বামী কন্যার মুখ দেখিতে দেখিতে যাত্রা করিলে! কিন্তু হায়! স্বামী পুত্র জীবিত থাকিতে, মরণ-কালে পিপাসায় একবিন্দু জলও পাইলে না! হৈমবতি! প্রাণাধিকে! এ হতভাগ্যের সুখ দুঃখের চিরসহচরি! আমায় ফেলিয়া যাইও না। ইহকালে তুমিই আমার অন্ধের যষ্টি; পরকালেও আমায় ত্যাগ করিও না।"

আর্ত্তনাদ শুনিয়া বিরজার ঘুম ভাঙ্গিল। জাগিয়া দেখিল, মাতা অচেতন হইয়া ভূতলে পতিতা। বালিকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রেবতীবাবু কন্যাকে পত্নীর মুখে একটু জল দিতে বলিলেন। বিরজা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া মায়ের মুখে দিল, এবং অঞ্চল সঞ্চালনে বাতাস করিতে লাগিল।

এইরূপ ভাবে রাত্রি গত হইল। উষার স্নিগ্ধালোকে পূর্ব্ব দিক আলোকিত হইল। বাসা ছাড়িয়া শাখায় বসিয়া পক্ষিগণ কূজন আরম্ভ করিল। ধীরে ধীরে সুশীতল প্রভাতসমীরণ বহিতে লাগিল। হৈমবতীর চৈতন্য হইল; ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে এক অভাবনীয় ভাবান্তর লক্ষিত

হইল; সে গভীর বিষাদ-কালিমা আর নাই; যেন কি আশার. আলোকে আলোকিত হইয়াছে। ধীরে ধীরে হৈমবতী বলিলেন, "নাথ! আর চিন্তা নাই, আমাদের এ দিন রহিবে না। আমি মূর্চ্ছাবশে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন কোনও দেবপুরুষ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, 'বৎসে! অধীর হইও না, এ দিন রহিবে না।' যিনি বলিয়াছেন, তিনি মিথ্যা বলেন নাই। নিশ্চয়ই আমাদের এ দিন রহিবে না।"

বলিতে বলিতে হৈমবতীর শীর্ণ দেহে যেন অপূর্ব্ব বলের সঞ্চার হইল। তিনি বিলক্ষণ সবলার ন্যায় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এমন সময়ে রামধন দুই মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া হৈমবতী অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলেন। ব্যস্ত হইয়া সেই দুই মুষ্টি তণ্ডুল রান্না করিয়া স্বামী ও কন্যার ক্ষুধার কত-কাংশ নিবৃত্তি করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পুণ্যের মধুময় পুরস্কার।

স্বামী ও কন্যাকে আহার করাইয়া হৈমবতী বাহিরে নির্জ্জনে বসিয়া আপন অদৃষ্ট-চিন্তা করিতেছেন। জঠরে অবিরাম ক্ষুধানল জ্বলিতেছে। এমন সময়ে ডাকহরকরা আসিয়া বলিল, "বাবুর নামে টাকা আছে।"

আশ্বস্ত-হৃদয়ে হৈমবতী হরকরাকে লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হরকরা একখানি পত্র ও এক শত টাকা বাহির করিয়া দিল। স্বামীর নাম বকলম লিখিয়া হৈমবতী টাকাগুলি গুণিয়া লইলেন। পত্র পড়িয়া দেখিলেন, হরিদাস পরীক্ষায় পুরস্কার পাইয়া এই এক শত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে; আরও মাসে মাসে কুড়ি টাকা পাইবে।

আনন্দভরে হৈমবতীর হৃদয় নাচিয়া উঠিল। অনাহারে প্রাণ ওষ্ঠাগত, এমন সময়ে শতমুদ্রা লাভ! তাহা আবার প্রিয়তম পুত্রের পরীক্ষার পুরস্কার! এ আনন্দের পরিমাণ কে করিতে পারে? পুলকিত-চিত্তে হৈমবতী ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিলেন।

একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রেবতীবাবু বলিলেন, "আমার হরিদাসের পুরস্কারের টাকা কয়টী একবার আমার হাতে দাও। বিধাতা দর্শন-সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন, একবার স্পর্শ করিয়া বাসনা মিটাই।"

দর দর ধারায় হৈমবতীর নয়ন ছুটিল! সেই মুহূর্ত্তে যদি হৈমবতীর মস্তকে বজ্রপাত হইত, অথবা পৃথিবী যদি দ্বিধা হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিত, তাহা হইলেই তাঁহার মর্ম্মাগ্নি নির্ব্বাণ হইত। হায়রে! এমন দেব দেবী কে আছেন? যিনি হৈমবতীর হৃদয়ের সমস্ত টুকু শোণিতের বিনিময়ে মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার স্বামীকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিতে পারেন।

এমন সময়ে দ্বারদেশে ভিখারী আসিয়া ডাকিল, "মা! ভিক্ষা দাও!" হৈমবতী কি ভিক্ষা দিবেন? ঘরে একমুষ্টি তণ্ডুলও নাই। হরিদাসের পুরস্কারের টাকা সর্ব্বপ্রথম ভিক্ষুককেই দান করিব, ভাবিয়া একটী টাকা লইয়া হৈমবতী দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াই হৈমবতী চমকিত হইলেন, দেখিলেন, দীর্ঘ জটা-জাল-মণ্ডিত বিভূতিভূষিত গৈরিক-বসন-পরিহিত প্রশান্ত-মূর্ত্তি এক সন্ন্যাসী দ্বারে দণ্ডায়মান। হৈমবতীর মনে পড়িল, গত রজনীতে তিনি যেন এই মূর্ত্তিই স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। ভক্তিভরে সন্ন্যাসীর পদতলে টাকাটী রাখিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন, "একি মা! আমরা মুষ্টিভিখারী, টাকা লইয়া কি করিব?"

কাতরকণ্ঠে হৈমবতী বলিলেন, "অভাগিনীর ঘরে এক মুষ্টি তণ্ডুলও নাই!"

সন্ন্যাসী। সে কি মা! তুমি অভাগিনী! যে মুষ্টি-ভিখারীকে একটী মুদ্রা দান করিতে পারে, সে যদি অভাগিনী, তবে ভাগ্যবতী কে? ওকি মা! তোমার চক্ষে যে ধারা বহিতেছে! কি কারণে তুমি কাঁদিতেছ?

হৈমবতী স্বীয় দুঃখের বিবরণ সংক্ষেপে সন্ন্যাসীকে জানাইলেন। শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি তোমার স্বামীকে একবার দেখিতে পারি? চক্ষুঃরোগের আমি কিছু ঔষধ জানি।"

পরম যত্নে সন্ন্যাসীকে লইয়া হৈমবতী গৃহে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী রেবতীবাবুর চক্ষু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ভগবানের কৃপায় এ রোগ ভাল হইতে পারে। আমি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। ততক্ষণ তোমরা আহারাদি করিয়া লও। দীর্ঘ অনাহারে তোমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। আমার যে ভিক্ষার তণ্ডুল আছে, এখন তাহাই রান্না করিয়া আহার কর, পরে আমাকে মূল্য দিলেই চলিবে।

তাড়াতাড়ি রন্ধন করিয়া হৈমবতী বিরজাকে খাওয়াইলেন। রেবতীবাবু খাইতে চাহিলেন না; তিনি ব্রাহ্মণ, দিবসে দুইবার অন্ন গ্রহণ করিতেন না। হৈমবতীও খাইতে চাহিলেন না; কিন্তু সন্ন্যাসী অনুরোধ করিলেন, বলিলেন, "অন্ন সম্মুখে রাখিয়া অনাহারে আত্মাকে পীড়া দেওয়া মহাপাপ।" সন্ন্যাসীর অনুরোধে হৈমবতী দুই দিন পরে উদরে দু'টি অন্ন দিলেন।

অনন্তর সন্ন্যাসী কয়েক রকম দ্রব্য মিশাইয়া পনরটী বটিকা প্রস্তুত করিলেন, এবং তাহা হৈমবতীর হস্তে দিয়া বলিলেন, "প্রত্যহ ইহার এক একটী মধুর সঙ্গে গুলিয়া চক্ষে ও ব্রহ্মতালুতে প্রলেপ দিতে হইবে। সপ্তাহ মধ্যেই উপশম বোধ হইবে। এক পক্ষ পর্য্যন্ত ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।"

অতঃপর সন্ন্যাসী আর এক মুহূর্ত্তও অবস্থান করিলেন না। এক দিন মাত্র রাখিবার জন্য হৈমবতী পা ধরিয়া অনুরোধ

করিলেন, সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা! সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম সন্ন্যাস, গৃহ-বাস নয়।"

তখনই হৈমবতী মধু আনাইয়া সন্ন্যাসীর কথা মত স্বামীর অঙ্গে ঔষধ লেপন করিলেন। প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের অমানুষিক শক্তি ছিল, তাঁহারা যোগবলে মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার করিতে পারিতেন। অদ্যাপি কোনও কোনও যোগী সন্ন্যাসীর কাছে আর্য্য-ঋষিদিগের কোনও কোনও অমানুষিক শক্তি গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে। হৈমবতীর পুণ্যফলে সন্ন্যাসী আসিয়া যুটিয়াছিলেন। সন্ন্যাসি-প্রদত্ত ঔষধে আশাতীত ফল ফলিল। তিন দিনে রেবতীবাবু চক্ষে আলোক অনুভব করিলেন, চারি দিনে অস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সাত দিনে লোক চিনিতে পারিলেন।

আবার সাত বৎসর পরে রেবতীবাবু সংসার দেখিতে পাইলেন,—সাত বৎসর পরে প্রিয়তমা হৈমবতীর মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। হৈমবতীর মুখ-পদ্ম হাস্যময়, কিন্তু দীর্ঘ-দুঃখ-পরিতাপে বিশীর্ণ ও শুষ্ক। হর্ষ-বিষাদে রেবতীবাবু বলিলেন, "হৈম! আজ সাত বৎসর পরে তোমার মুখ-কমল দেখিতে পাইলাম; কিন্তু তেমন অম্লান-কান্তি বোধ হয় আর দেখিতে পাইব না। বিষাদের বিষদন্তে আমার সাধের কমল যেরূপ জর্জ্জরিত হইয়াছে, তাহাতে বোধহয় আর তেমন সরসে হাসিবে না।"

আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে হৈমবতী বলিলেন, "ভগবান্ আমাদের দুঃখের রাত্রি ঘুচাইয়া সুখের দিন দিয়াছেন, আবার আমাদের হাসিবার সময় আসিয়াছে। জয় জগদীশ্বর! আমরা তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্য্যোগান্তে রৌদ্র,—দুঃখান্তে সুখ।

ঈশ্বর হৈমবতীর সকল দুঃখই দূর করিলেন। রেবতী-বাবু পূর্ব্ববৎ দৃষ্টি-শক্তি পাইলেন। মানসিক কষ্টের শান্তি হওয়াতে, তাঁহার শরীরও ক্রমশঃ সবল হইয়া উঠিল। আবার তিনি কর্ম্ম-স্থলে যাত্রা করিলেন। হৈমবতী বলিলেন, "পরের দাসত্ব করিবার আর প্রয়োজন নাই; বিধাতা যখন মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, তখন মোটা ভাত, মোটা কাপড় একরূপে চলিবেই। গৃহে বসিয়া কায়িক পরিশ্রমে যাহা উপার্জ্জন হইবে তাহাই যথেষ্ট, আর দূর দেশে গিয়া কাজ নাই।" রেবতীবাবু তাহা শুনিলেন না। বিরজার বিবাহের জন্য কিছু অর্থের প্রয়োজন; চাকরী না করিলে কোথা হইতে আসিবে?

অল্প দিন পরে সদ্বংশীয় সুপাত্রের সঙ্গে বিরজার বিবাহ হইল। হরিদাসের বিদ্যাশিক্ষারও ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল; একে একে তিনটী পরীক্ষায় বিশেষ সুখ্যাতির সহ পুরস্কার পাইয়া পাশ হইল। জনক জননীর আনন্দের সীমা রহিল না।

তখনই নানাস্থান হইতে সম্ভ্রান্ত ধনশালীর গৃহে হরিদাসের বিবাহ সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। জনৈক সুপ্রতিষ্ঠিত জমিদার তাঁহার একমাত্র কন্যাকে রেবতীবাবুর পুত্রবধু করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। এ সম্বন্ধে হরিদাসের অপুত্রক শ্বশুরের জমিদারীতে সত্তবান হওয়ার সম্ভব:—বিশেষ লাভের

সম্বন্ধই বটে। সমাজেও যথেষ্ট সম্মানের কারণ। সুতরাং রেবতীবাবুর ইহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি হইবারই কথা। হৈমবতীরও আপত্তি ছিল না;—তবে এত বড় লোকের সহিত কুটুম্বিতা, কি জানি যদি অবস্থা বৈষম্যে আত্মীয়তা বজায় না থাকে; অথবা বধূ পৈতৃক ধন-সম্পদ-গৌরবে অধিক মাত্রায় গর্ব্বিতা বা বিলাসিনী হইয়া পড়ে। যাহা হউক, হরিদাসের বিবাহ বিষয়ে গিরিজাবাবুর মত লওয়া আবশ্যক; হরিদাসের সকল সৌভাগ্যের হেতুইত তিনি। হৈমবতী এ সম্বন্ধে গিরিজানাথকে লিখিবেন স্থির করিলেন।

ইতিমধ্যে এক দিন গিরিজাবাবুর মাতা হৈমবতীর কাছে একখানি পত্র লিখিলেন। পরস্পর পরস্পরের কাছে বরাবর পত্র লিখিতেন। এবার গিরিজাবাবুর মাতা লিখিয়াছেন;—"ভগিনি! বহু দিন তোমায় একটী কথা বলি বলি করিয়া বলি নাই। আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কখন কি হয় বলিতে পারি না; তাই মনের কথাটী এ সময়ে বলিয়া রাখা উচিত।

"আমার কমলার এই এগার বৎসর বয়স হইয়াছে। তোমার হরিদাসের বয়স এখন কুড়ি বৎসর। উভয়ের মধ্যে যেরূপ ভালবাসা জন্মিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছি। কমলার বয়স যখন দুই বৎসর, তখন হরিদাস আমাদের কাছে আসিয়াছে। হরিদাস আসা অবধি, কমলার হরিদাসের সঙ্গে নইলে আহার হয় না, হরিদাসের সঙ্গে নইলে স্নান হয় না। হরিদাসের কাছে নইলে তাহার পড়া শিক্ষা হয় না। ছেলে বেলায় আমরা যদি কমলাকে কোনও

উঁচু কথা বলিতাম, সে গিয়া হরিদাসের কাছে নালিস করিত। হরিদাস যদি তাহাকে কোনও দিন কাল মুখে কিছু বলিত, তবে সে দিন তাহার আহার হইত না, স্নান হইত না, হরিদাস আসিয়া জোর করিয়া কোলে না লইলে, তাহার রাগ ভাঙ্গিত না। হরিদাস কখনও বাড়ীতে গেলে সে প্রত্যহ পাঁচ ছয় বার জিজ্ঞাসা করিত, 'হরিদাস কবে আস্‌বে ?' হরিদাসও, কমলাকে দু'দণ্ড না দেখিলে অস্থির হইত। এখন উভয়েই বড় হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব ভাবের কিছু মাত্রও বিপর্য্যয় হয় নাই।

"আমার বহু দিন হইতেই ইচ্ছা, এই দুইটীকে ডানি বাঁয় বসাইয়া দেখিয়া চক্ষু সফল করিব; কিন্তু আমার আর অধিক দিন সময় নাই, বোধ হয় আগামী বৈশাখের পর বৈশাখ আবার আমি দেখিতে পাইব না।

"দিদি ! কমলা আমার বড় আদরের বস্তু, এক বৎসরের বালিকা কমলাকে লইয়া আমি বিধবা হইয়াছি। আমার এত আদরের ধন তোমার কাছে রাখিয়া যাইব সাধ করিতেছি। তুমি পরের ধন কুড়াইয়া যত্ন করিতে বড় ভালবাস। আমার গিরিজা ত তোমারই; কমলাও কি তোমার হইবে না ? ভাবিও না, তোমার হরিদাসের বিবাহ হইলে, তাহার পড়া শুনার কোনও ক্ষতি হইবে। হরি-দাসের মত ছেলের কিছুতেই অবনতি হইতে পারে না। ভগিনি ! তুমি রত্ন-গর্ভা, তোমার হরিদাসের মত রত্ন আমি এ রাজধানীতে দু'টী দেখি না।

"আমার গিরিজার আজ কাল আর্থিক অবস্থা ভাল নয়।

সরিকগণের সঙ্গে মোকদ্দমা করিয়া বিলক্ষণ ঋণী হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সুধু হাতে তোমার স্বামী আমার কমলাকে বধূ করিবেন কি না, আশঙ্কা করিতেছি। কিন্তু হরিদাস তোমার অমূল্য রত্ন, তোমার ধন দৌলতের অভাব কি?

"এ বিষয়ে অধিক কি লিখিব, স্বামীর কাছে পরামর্শ স্থির করিয়া সত্বর আমাকে সংবাদ দিও। হরিদাস, গিরিজানাথ প্রভৃতি সকলেই ভাল আছে।"

পত্র পড়িয়া হৈমবতী স্বামীকে দেখাইলেন। রেবতীবাবু দেখিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, হরিদাস এত বড় একটা জমিদারী পাইতে যাইতেছিল, তাইত বিশেষ চিন্তারই কথা।"

হৈমবতী বলিলেন, "রাজত্ব ত্যাগ করিয়াও গিরিজানাথের ভগিনীকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যে কন্যার ভ্রাতা গিরিজানাথ, সে অবশ্য সুশীলা সন্দেহ নাই। আমি রত্নালঙ্কার মণ্ডিত বড় মানুষের ঝি বধূ চাই না, গুণবতী হইলে দরিদ্রের কন্যাই ভাল। বিশেষ গিরিজাবাবুও নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তি নন্।"

রেবতী। সহরের মেয়ে পাড়া গাঁয়ে দরিদ্রের ঘরে এলে অসুবিধা হতে পারে। তাদের চাল চলন এক রকম, আমাদের এক রকম।"

হৈমবতী বলিলেন, "সে ভার আমার উপর। যেমন মেয়েই হউক, আমি দু'দিনেই তাহাকে আপনার মত করিয়া লইতে পারিব। গিরিজাবাবুর মাতার মনোভঙ্গ করা যাইতে পারে না।"

রেবতীবাবু সম্মতি দিলেন। হৈমবতী গিরিজানাথের মাতাকে সংবাদ লিখিলেন। আগামী বৈশাখেই বিবাহের শুভ-লগ্ন স্থির হইল।

সুখের কথা সংক্ষেপেই বলিতে হয়। বহু আড়ম্বরে বাদ্যোত্তম করিয়া হরিদাস নববধূ সহ গৃহে আসিল। উল্লাসে হৈমবতী বধূকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "বল দেখি মা, আমি কে ?"

বধূ লজ্জায় কথা বলিল না। হৈমবতী বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অগত্যা বধূ লজ্জায় মুখ লুকাইয়া বলিল, "মা।"

হৈমবতী বলিলেন, "তুমিও আমার মা।"

নিকটে একটী ননীর পুতুল পুত্র কোলে লইয়া বিরজা দাঁড়াইয়াছিল। হৈমবতী হাসিয়া বিরজাকে বলিলেন, "তোমা-দের দুই জনের আমি এক মা, তোমরা আমার দুই মা।"

বিরজা বলিল, "হাজার মাও আমাদের এক মায়ের তুল্য নয়।"

আমরা পরমানন্দে লক্ষ্মী মা হৈমবতীর চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলাম।

সম্পূর্ণ।